সৌহার্দ সম্প্রীতি ও মৈত্রীর সেতুবন্ধ

ভারত বিচিত্রা

মার্চ ২০১৪

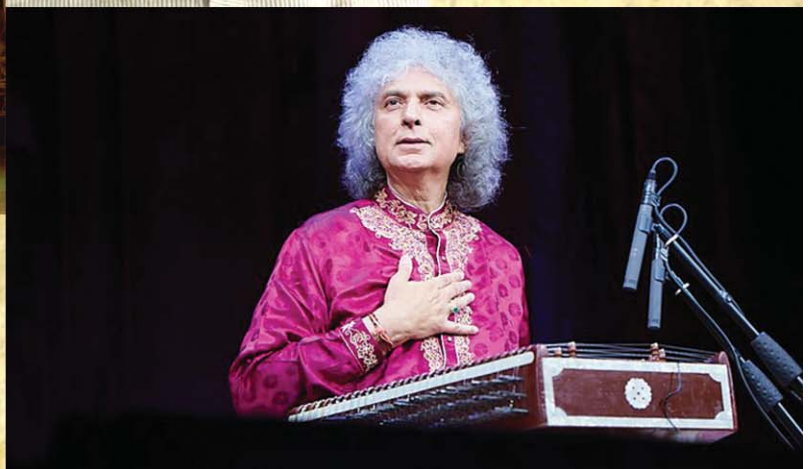

৪ মার্চ ২০১৪ মায়ানমারের নে পাই টয়ে অনুষ্ঠিত তৃতীয় বিআইএমএসটিইসি শীর্ষ সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী ড. মনমোহন সিংয়ের সঙ্গে বাংলাদেশের মাননীয়া প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাক্ষাৎ

২৩ মার্চ ২০১৪ মায়ানমারের নে পাই টয়ে অনুষ্ঠিত তৃতীয় বিআইএমএসটিইসি শীর্ষ সম্মেলনে সদস্য রাষ্ট্রসমূহের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও সচিববৃন্দ

এমসিসিআইএর ত্রৈমাসিক মধ্যাহ্নভোজ বৈঠকে কর্মকর্তাদের সঙ্গে প্রধান অতিথি ভারতের হাই কমিশনার শ্রী পঙ্কজ সরন

২৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ বরগুনায় ২০০ গভীর নলকূপ স্থাপন অনুষ্ঠানে ভারতের হাই কমিশনার শ্রী পঙ্কজ সরন ॥ ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ জাতীয় প্রেস ক্লাবে ভারত সরকারের কম্পিউটার উপহার প্রদান অনুষ্ঠানে প্রেস ক্লাবেব কর্মকর্তাদের মাঝে ভারতের ডেপুটি হাই কমিশনার শ্রী সন্দীপ চক্রবর্তী

সৌহার্দ সম্প্রীতি ও মৈত্রীর সেতুবন্ধ

ভারত বিচিত্রা

বর্ষ চলিশ | সংখ্যা ১১ | ফাল্গুন-চৈত্র ১৪২০ | মার্চ ২০১৪

ওড়িশী নৃত্য

গানের ভেলায়

সূচিপত্র

পৃথিবীর বৃহত্তম গণতন্ত্রে নির্বাচন পরিচালনা ০৪
রবীন্দ্র মনন ও সাহিত্যে ঠাকুরবাড়ির নারীরা ০৭
সরোজিনী নাইডুর জীবন ও কবিতা ১১
ছোটগল্প: আশীর্বাণী ১৪
ওড়িশী নৃত্য ২০
কবিতা ২৪
বাংলাদেশের উপাচার্যদের ভারত সফর ২৬
গানের ভেলায় বেলা অবেলায় ২৮
তাওয়াং ॥ অরুণাচলের পর্যটন শহর ৩১
উপন্যাস: নিঃসঙ্গ মানুষের কলমুখর সময় ৩৫
অনুবাদ গল্প: ভরা চাঁদের রাত ৪১
আনিসুজ্জামান ॥ বাঙালির বাতিঘর ৪৫
শেষ পাতা: প্রকাশ কর্মকার ৪৮

রবীন্দ্র মনন ও সাহিত্যে ঠাকুরবাড়ির নারীরা

বিশ্ব সংস্কৃতির সুদীর্ঘ ধারায় রবীন্দ্রনাথ এক বিস্ময়কর প্রতিভা। উনিশ শতকের রেনেসাঁর স্বর্ণোজ্জ্বল প্রভায় আলোকিত হয়ে উঠেছিল রবীন্দ্রনাথের জন্মস্থান জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি। এ পরিবারটি নিয়ে গভীর অনুসন্ধিৎসা, চলছে নিরন্তর অন্বেষণ। আবিষ্কৃত হচ্ছে নতুন নতুন তথ্য, কখনও বা উদ্ভাসিত হচ্ছেন লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকা কীর্তিমান কেউ। একই পরিবারে এত প্রতিভাধর ব্যক্তিত্ব বিশ্বসাহিত্যে বিরল। শুধু শিল্পসাহি ত্যে নয়– কারও কারও সমাজ জীবনেও রয়েছে প্রভূত অবদান। উনিশ শতকে বাংলার নবজাগরণের ইতিহাসে নারী উন্মেষের যে অধ্যায়টি রচিত হয়েছিল, তাতে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির অবদান সবচেয়ে বেশি। ঘেরাটোপের রহস্য ছিঁড়ে, রক্ষণশীল সমাজের রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে, ঠাকুরবাড়ির মেয়েরা জীবনচর্চার সমস্ত ধারায় যেভাবে নিজেদের নিয়োজিত করেছিলেন, তা যেমন চমকপ্রদ তেমনিই বিস্ময়কর।

শিল্প নির্দেশক ধ্রুব এষ
গ্রাফিক্স নূরন নাহার

সম্পাদক নান্টু রায়
ফোন ৯৮৫০১৯৩-৭, ৯৮৮৮৭৮৯-৯১ এক্স: ১৪৯
ফ্যাক্স ৮৮-০২-৯৮৮২৫৫৫, e-mail: informa@hcidhaka.gov.in

মুদ্রণ গ্রাফোসম্যান রিপ্রোডাকশন এন্ড প্রিন্টিং লি.
৫৫/১ পুরানা পল্টন ঢাকা-১০০০ ফোন ৯৫৫৪৮০৪

প্রকাশক ও মুদ্রাকর ভারতীয় হাই কমিশন
বাড়ি নং ২ সড়ক নং ১৪২ গুলশান-১ ঢাকা-১২১২

ভারতীয় হাই কমিশন, ঢাকা ওয়েবসাইট: www.hcidhaka.gov.in; ভিজিট করুন আমাদের page: High Commission of India, Dhaka; ইন্দিরা গান্ধী সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের একাউন্ট: Iccr Dhaka

ভারতীয় জনগণের শুভেচ্ছাসহ বিনামূল্যে বিতরিত ভারত বিচিত্রায় প্রকাশিত সব রচনার মতামত লেখকের নিজস্ব– এর সঙ্গে ভারত সরকারের কোন যোগ নেই
এই পত্রিকার কোনও অংশের পুনর্মুদ্রণের ক্ষেত্রে ঋণস্বীকার বাঞ্ছনীয়

পাঠকের পাতা

অবিস্মরণীয় গায়ক মান্না দে

ভারত বিচিত্রা নভেম্বর ২০১৩ সংখ্যাটি মান্না দে স্মারক সংখ্যা বলে উলেখ করেছেন সম্পাদক। বাংলাদেশের নন্দিত কথাসাহিত্যিক ইমদাদুল হক মিলনের লেখা শ্রদ্ধাঞ্জলিতে মান্না দে ও অন্যান্য শিল্পীর গানে সেই সময়ের তরুণমনের পর্দায় যে শিহরন-স্নিগ্ধ আবেগের ঢেউ লেগে যেত তারই সরস বর্ণনা পাওয়া গেল। তাঁর সঙ্গে আমার মনের না-বলা বোবা আবেগ-নন্দিত অনুভূতিটির হুবহু মিল খুঁজে পেলাম। প্রাক-যৌবনের বিশেষ মুহূর্তে শরৎচন্দ্রের দেবদাস-পার্বতীর অনুরাগরঞ্জিত ক্ষণটি যেন সানাইয়ের করুণ সুরমুর্ছনার আলাপে মান্না দের কণ্ঠে 'সুন্দরী গো দোহাই তোমার মান কোরো না' রূপের আশ্চর্য মায়াজাল বোনে যুবক-যুবতীর মনে। আর এই গানের শিল্পীকে ধন্যবাদ জানিয়ে অতৃপ্তির অশান্ত ঢেউ আমাদের মনে নদীর ঢেউয়ের মত তীরে এসে আছড়ে পড়ত– আমরা স্বপ্নের মায়াজালে বুঁদ হয়ে থাকতাম। জগন্ময়, হেমন্ত, ধনঞ্জয়, শ্যামল, সন্ধ্যা, প্রতিমা প্রমুখ গায়ক-গায়িকাদের গান 'সুরের আকাশে তুমি যে গো শুকতারা' অথবা 'আমার স্বপ্নে দেখা রাজকন্যা থাকে' গত ৬-৭ দশকের রোমিও-জুলিয়েটদের মনে ধ্রুবতারা হয়ে দীপ্যমান, একথা অস্বীকার করার জো নেই।

শিল্পী মান্না দে তাঁর কাকা কৃষ্ণচন্দ্র দের মতই মোহনকণ্ঠের অধিকারী ছিলেন। আরও একটি জিনিস লক্ষ্যণীয় যে, মান্না দে স্বামী বিবেকানন্দের মত শরীর চর্চার মাধ্যমে দম নেয়া ও ছাড়ার যোগসাধনায় সিদ্ধিলাভের জন্য প্রাণায়াম অভ্যাস করেছিলেন। রাগসঙ্গীতের সাধনায় দমের প্রয়োজনীয়তা যে অপরিহার্য, সে কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। আজ থেকে প্রায় সাত দশক আগে আমার জন্মস্থান বরিশাল জেলার উত্তর সাহাবাজপুরের যে আবাসিক এলাকায় বার মাসে তের পার্বণ অনুষ্ঠিত হত, সেখানে কলকাতা থেকে আগত ছাত্র-ছাত্রী ও সংস্কৃতিমনা লোকদের সংস্পর্শে প্রথম 'ফিরে চল, ফিরে চল আপন ঘরে' গানটি শুনি। পরে জেনেছিলাম, *চণ্ডীদাস* চলচ্চিত্রে ব্যবহৃত গানটির গায়ক কৃষ্ণচন্দ্র দে একজন সুকণ্ঠী অন্ধ গায়ক।

ভারত বিচিত্রার একই সংখ্যায় ভারতের কবি ও লেখক মলয়চন্দন মুখোপাধ্যায়ের মান্না দের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে বাংলা সঙ্গীতের আনুপূর্বিক বিকাশ এবং হালকা ও লঘু সঙ্গীতশিল্পীদের সাফল্য এবং বোম্বে চলচ্চিত্র জগতে পদার্পণ ও প্রতিষ্ঠাবিষয়ক মননশীল লেখাটি খুব আগ্রহ নিয়ে পড়লাম। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে তৈরি গান 'আমি দুরন্ত বৈশাখী ঝড়, তুমি যে বহ্নিশিখা' খুব জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। আমাদের নবীনমনে গানটি দারুন আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। এসময় হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের 'কোন এক গায়ের বধূর কথা তোমায় শোনাই শোন, রূপকথা নয় সে নয়' আমাদের মুগ্ধ করেছিল। একই সময়ে আইপিটিএ-এর শিল্পী সলিল চৌধুরী, হেমাঙ্গ বিশ্বাস প্রমুখের সুরে বাংলা গান সাম্যবাদী ঘরানায় দীক্ষিত হল। বিপবী কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের 'রানার' কবিতাটির সঙ্গীতে রূপান্তর সমাজে এক অনবদ্য গতিবেগ সঞ্চার করল। ভারতের স্বাধীনতা লাভ, সাম্প্রদায়িক শক্তির উত্থান এবং দেশত্যাগজনিত উদ্বাস্তু সমস্যা আর অভাব-অভিযোগ নিয়ে অনেক গণসঙ্গীতের সৃষ্টি হল। পাশাপাশি লাল চিনে কমিউনিস্ট শাসনের প্রতিষ্ঠা হতাশাগ্রস্ত ভারতীয়দের বিশেষ করে বাঙালিদের দারুণভাবে উজ্জীবিত করে তুলল। ফলে প্রাচীন পুঁথি-পাঁচালী থেকে শুরু করে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য প্রবর্তিত মহানামসংকীর্তন, বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দে মাতরম্' এবং ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে লিখিত রবীন্দ্রনাথের দেশপ্রেমমূলক সঙ্গীত, দ্বিজেন্দ্রলাল, রজনী কান্ত, অতুলপ্রসাদ, নজরুলের যুগের চাহিদা-মত সৃষ্ট গানগুলি জনপ্রিয়তা লাভ করল। অষ্টাদশ শতাব্দীর সাংস্কৃতিক জাগরণের প্রেক্ষাপটে বাঙালির সাহিত্য ও সঙ্গীতে ব্যাপক রূপান্তর ঘটল।

দেশভাগের পরে বাংলার সঙ্গীতাকাশে এক ঝাঁক হালকা ও লঘু সঙ্গীত শিল্পীর আবির্ভাব হয়। ১৯৫০ সালে পশ্চিমবঙ্গের ২৪ পরগনার ইছাপুরে থাকার সময় *বেতার জগত* পত্রিকায় এঁদের পরিচয় পেতাম। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় যাঁরা বোম্বের বিকাশমান চলচ্চিত্রজগতে চলে গেলেন এবং লক্ষ্মী ও সরস্বতীর আশীর্বাদধন্য হলেন, তাঁদের মধ্যে কৃষ্ণচন্দ্র দে এবং মান্না দেও ছিলেন। তখন কলকাতার শিল্পীরা প্রয়োজনানুরূপ লক্ষ্মীর কৃপা থেকে বঞ্চিত ছিলেন। তবুও বাঙালি সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখার তাগিদে হিন্দি চলচ্চিত্র জগতের দিগ্বিজয়ী আগ্রাসনের মধ্যেও বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে সত্যজিৎ রায়ের আবির্ভাব এবং বিভূতিভূষণের *পথের পাঁচালীর* মত উপন্যাসের চলচ্চিত্ররূপ দেওয়ার কুশলতায় সমগ্র বিশ্বতো বটেই, বোম্বের চলচ্চিত্রজগতও বিস্ময়ভরা চোখে তাকিয়ে ছিল। ফলে পঞ্চাশের দশকের কুশীলবেরা আরও দামী হয়ে উঠলেন বোম্বের চিত্রজগতে। বাঙালির সংস্কৃতির ব্যাপক সম্প্রসারণ শুরু হল। উপেক্ষিত রবীন্দ্রসঙ্গীত নতুন প্রাণ পেল। মান্না দে, কিশোরকুমার, সন্ধ্যা মুখার্জিরা ব্যাপক খ্যাতি অর্জন করলেন। কৃষ্ণচন্দ্র দে, মান্না দের প্রতিভার মূল্যায়ন শুরু হল। মলয়চন্দন মুখোপাধ্যায়ের লেখায় বাংলার শিল্পীদের লক্ষ্মীর সন্ধানে গমন এবং সরস্বতীর কৃপায় প্রতিষ্ঠা লাভের ইঙ্গিতটি পাওয়া গেল।

সমীররঞ্জন শীল
'আনন্দ নিকেতন', হাউস ৭৯
রোড ৪, বক বি, নিকেতন, গুলশান ১
ঢাকা ১২১২

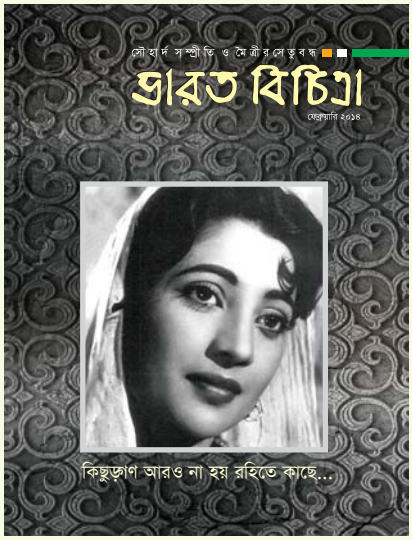

সাফল্য কামনা

ভারত বিচিত্রা কর্তৃপক্ষকে অভিনন্দন। ১৯৮০ সাল থেকে আমি *ভারত বিচিত্রার* গ্রাহক। তখন আমি ভোলার লালমোহন উপজেলার লালমোহন উপজেলার লালমোহন উচ্চ বিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণির ছাত্র। এখনও আমি প্রতিমাসে *ভারত বিচিত্রা* পড়ে থাকি। *ভারত বিচিত্রা* শিক্ষকের মত আমাকে ভারত সম্পর্কে জ্ঞানদান করে আসছে। আমি *ভারত বিচিত্রার* অতুল্য সাফল্য কামনা করি।

আহমেদ বজলুর রহমান
সূত্র ফেসবুক

সম্পাদকীয়

পাতাঝরা শীতের রিক্ততা শেষ হয়েছে। কুয়াশার চাদর সরিয়ে সূর্যের দেখা মিলছে প্রতিদিন। প্রকৃতিতে তাই সাজ সাজ রব। গাছে গাছে নতুন পাতার হাতছানি– এস সবাই, পুষ্পপল্লব নিজেকে সুসজ্জিত কর, বিকশিত কর। কোকিলের কুহুতানে দশদিক মুখরিত। পুষ্পকোরকে ভ্রমরের মধুগুঞ্জরণ। আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে। ওগো গৃহবাসী, খোল দ্বার খোল লাগল যে দোল, স্থলেজলে বনতলে লাগল যে দোল। জগতের আনন্দযজ্ঞে আমাদের সবার নিমন্ত্রণ।

প্রকৃতির কথাই যখন উঠল, তখন বলতে হয়, নারীও প্রকৃতি। বাংলার জন্যে শাঘার বিষয় এই যে, এই বসন্তে প্রকৃতি যখন ঋজুমতী হয়, তখনই উদ্‌যাপিত হয় বিশ্ব নারী দিবস। বাংলাদেশের জন্যে বসন্তে নারী দিবস উদ্‌যাপন যেন নারীর মাতৃরূপেরই বন্দনা। আমাদের ভূখণ্ডে অবগুণ্ঠনবতী নারীকে ক্ষমতায়িত করার তথা অজ্ঞানতার অন্ধকার থেকে জ্ঞানলোকে স্নাত করার কথা প্রথম ভেবেছিলেন প্রাতঃস্মরণীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। সেই নবজাগরণের কালে পথিকৃতের ভূমিকা পালন করেছিলেন ঠাকুরবাড়ির মেয়েরা, অবরোধবাসিনী মুসলিম নারীর মুক্তির সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিলেন মহিয়সী বেগম রোকেয়া, এগিয়ে এসেছিলেন বিদূষী রাজনীতিক সরোজিনী নাইডু। গান্ধীজীর অহিংস আন্দোলনে, রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনের জন্যে নিজামের অর্থানুকূল্য প্রাপ্তিতে, ভারতে হিন্দুমুসলিম দ্বৈরথে– সর্বত্র এই আলোকোত্তীর্ণ নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণ ছিল। তাঁর মৃত্যুকে স্মরণীয় করে রাখতে ভারতে আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদ্‌যাপন– তাঁর সামগ্রিক কর্মকাণ্ডেরই স্বীকৃতি। তিনি কবিতা লিখেও প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তাঁকে বলা হত ভারতের বুলবুল– নাইটিঙ্গেল অফ ইন্ডিয়া।

সম্প্রতি শিল্পী প্রকাশ কর্মকার লোকান্তরিত হলেন। প্রকাশ সেইসব প্রবচনীয় শিল্পীর মহত্তম উদাহরণ যিনি শত অভাবঅনটনের মধ্যেও শিল্পধারা থেকে বিচ্যুত হননি– আপস করেননি প্রাতিষ্ঠানিকতার সঙ্গে। বরাবরই তাঁর চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন হয়েছে রাস্তায়। চার দেয়ালের মধ্যে তিনি তাঁর সৃষ্টিকর্মকে বন্দী করে রাখতে চাননি। শীতের রিক্ততা ফুরোতে না ফুরোতেই প্রকাশ পার্থিব মায়াজাল ছিন্ন করে পরলোকে যাত্রা করলেন। আমরা তাঁর বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করি।

প্রবন্ধ

পৃথিবীর বৃহত্তম গণতন্ত্রে নির্বাচন পরিচালনা

এস ওয়াই কুরেশি

অর্থনৈতিক, পারমাণবিক বা তথ্যপ্রযুক্তিতে অগ্রগণ্য হয়ে ওঠার বহু আগে উন্নত ও প্রাণবন্ত নির্বাচনী গণতন্ত্র হচ্ছে ভারতের সুনির্দিষ্ট ও স্থায়ী পরিচিতি। একটি মহৎ সংবিধানে প্রোথিত এই গণতন্ত্র লালিত হয়েছে সংসদ, বিচারবিভাগ, রাজনৈতিক দল, গণমাধ্যম ও সর্বোপরি ভারতের জনগণের দ্বারা, যার মধ্যে ভারতের নির্বাচন কমিশনের কিছু সুনির্দিষ্ট অবদান আছে। বিভিন্ন মহলের সন্দেহ ও আশংকা সত্ত্বেও আধুনিক ভারতের স্থপতিরা সাধারণ ভারতীয়র ক্ষমতার আসনে তার প্রতিনিধি নির্বাচনের বুদ্ধিবি বেচনার ওপর আস্থা রেখে প্রাপ্ত বয়স্কের সার্বজনীন ভোটাধিকারের ব্যবস্থা করেছিলেন। নির্বাচনী গণতন্ত্র বেছে নেওয়াকে নানাভাবে অভিহিত করা হয়েছিল: সামনের দিকে এক বিরাট উল্লম্ফন, এক জোরালো উদ্যোগ, এক অসামান্য অভিযান। ভোটের মাধ্যমে যখন স্বাধীনতা সাধারণ মানুষের হাতে চলে আসে, তখন ভারতের ৮৪ শতাংশ মানুষ নিরক্ষর, সমানসংখ্যক মানুষ বর্ণভিত্তিক জাতপাত্লব ব্যবস্থায় বিভক্ত অসম সমাজে দারিদ্র্যের মধ্যে বসবাস করছে। ভারতের নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেনের সেই বিখ্যাত উক্তি প্রমাণ করেছে যে, কোন দেশ গণতন্ত্রের জন্য উপযোগী হয় না, এটি গণতন্ত্রের মাধ্যমে উপযোগী হয়ে ওঠে। সংবিধান গণতন্ত্রের অগ্রযাত্রার জন্যে একটি প্রচণ্ড রকমের স্বাধীন নির্বাচন কমিশন সৃষ্টি করেছে।

গত তেষট্টি বছরে নির্বাচন কমিশন শান্তিপূর্ণ, সুশৃংখল ও ক্ষমতার গণতান্ত্রিক পালাবদলের জন্যে ১৫টি লোকসভা এবং রাজ্য বিধানসভার ৩৫০টি নির্বাচন পরিচালনা করেছে। জাতীয় ও রাজ্য সরকারে এবং বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে নেতৃত্ব দিতে সমাজের প্রান্তিক অংশ, কৃষক, নারী ও সংখ্যালঘুদের নেতা তৈরি করতে ভারতে নির্বাচনী গণতন্ত্র চর্চার অনেক কিছু করার আছে। দলসমূহের মধ্যে বৈচিত্র্য বৃদ্ধি এবং জোট গঠনের মাধ্যমে সরকার গঠন বিচিত্র

প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ভোটদান

ইলেকট্রোনিক ভোটিং মেশিন

আশ্লআকা ক্ষার প্রতিফলন।

আজ আপনি যদি শুধু সংখ্যার দিকেই তাকান, তাহলে ভারতের নির্বাচনের পরিসংখ্যান মনে রাখবার মত। ২০১৪ সালের ১ জানুয়ারি ভারতের নির্বাচন তালিকায় রয়েছে প্রায় ৭৮ কোটি ভোটার, যা উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা বা ইউরোপের সমস্ত দেশ বা গোটা আফ্রিকার মোট জনসংখ্যার চেয়ে বেশি। ২০০৯ সালে অনুষ্ঠিত সর্বশেষ সংসদ নির্বাচনকে বিশ্বের বৃহত্তম মানবীয় ব্যবস্থাপনার নজীর বলে বর্ণনা করা যায়। এই নির্বাচনে ৭১ কোটি ৪০ লাখ ভোটার, ৮ লাখ ৩৫ হাজার ভোট কেন্দ্র, ১১লাখ ৮০ হাজার ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন এবং ১ কোটি ১০ লাখ কর্মকর্তাকর্মচারী তথা জনবল নিয়োজিত ছিল।

ভৌগোলিক অঞ্চল বা নির্বাচনী এলাকার আয়তন বিবেচনা করে ভারতীয় গণতন্ত্রের বিশালত্ব পরিমাপ করা যাবে না, এর সঙ্গে রয়েছে প্রতিটি নাগরিকের কাছে পৌছনোর দুশ্চিন্তাও। পশ্চিম ভারতের গির বনাঞ্চলে একজন ভোটারের জন্যও আমাদের আলাদা ভোট কেন্দ্র রয়েছে।

ভারত সম্ভবত বিশ্বের সবচেয়ে বৈচিত্র্যময় দেশ, এটা হতে পারে ভৌগোলিক– মরুভূমি, পাহাড়পর্বত, সমতলভূমি, বনাঞ্চল, দ্বীপ, উপকূলীয় অঞ্চল– অথবা হতে পারে বহু ধর্ম, বহু সংস্কৃতি, বহুভাষী, বহু জাতিগোষ্ঠীগত। এই বৈচিত্র্যের দাবি মেটানো প্রয়োজন। একইভাবে সন্ত্রাস, নিরাপত্তা ঝুঁকি, বিশ্বায়নের সঙ্গে তাল মেলানো এবং জায়মান মধ্যবিত্তের তথ্য সংগ্রহের প্রত্যাশা বৃদ্ধির চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করা কঠিন। অন্তর্ভুক্তিমূলক অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে অবাধ, নিরপেক্ষ, স্বচ্ছ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন করা নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব।

ভারতের নির্বাচন ব্যবস্থাপনা একটি সার্বক্ষণিক প্রক্রিয়া। প্রত্যেক প্রার্থীর জন্য আলাদা ব্যালট বাক্স থেকে মার্কিং ব্যবস্থা, ইভিএম (ইলেকট্রোনিক ভোটিং মেশিন) পর্যন্ত এক দীর্ঘ যাত্রা। ইভিএম হচ্ছে সহজ, বন্ধুভাবাপন্ন, সাশ্রয়ী এবং দ্রুত নির্ভুল ভোটদান ও ভোটগণনা ব্যবস্থা– এটি নির্বাচন পদ্ধতিতে আমূল পরিবর্তন এনেছে।

কিভাবে লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড নিশ্চিত করা যায়, সেটি আমাদের নির্বাচনের একটি বড় চ্যালেঞ্জ। ক্ষমতাসীন দলের আজ্ঞাবহ রাজ্যের সকল সম্পদ। কাজেই সংশ্লিষ্ট সকলের, বিশেষ করে ক্ষমতাসীন দলের অবশ্যমান্য একটি আচরণবিধি তৈরি করা প্রয়োজন।

ভারতের রাজনৈতিক দলগুলির ঐকমত্যের সাহায্যে অনন্য মডেল আচরণবিধি প্রণয়ন সম্ভব হয়েছে এবং গণতন্ত্রের স্বার্থে এটি তাদের এক বিশেষ অবদান। কোন নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পর থেকে নির্বাচন কমিশন এই আচরণবিধি প্রয়োগ করে। মডেল আচরণবিধির কোন অনেপনীয় পৃষ্ঠপোষকতা নেই এবং এর অনেক প্রবিধান আইনগতভাবে কার্যকর করা সম্ভব নয়। তথাপি এটি ব্যাপকভাবে পালিত হয়। জনমত হচ্ছে এটি কার্যকর করার নৈতিক সম্মতি। যদিও ভারতীয় নির্বাচন কমিশন পেশিশক্তি ও মজুত শক্তির চ্যালেঞ্জ কার্যকরভাবে ব্যর্থ করে দিয়েছে, তবু দুর্নীতি ও টাকার শক্তি নির্বাচন প্রক্রিয়াকে দূষিত করতে এবং এর সত্যিকার শক্তিকে খাটো করে দেখতে পারে বলে নির্বাচন কমিশন উদ্বিগ্ন।

নির্বাচন শুধু অবাধ ও সুষ্ঠু হলেই হবে না, সামাজিকভাবেও ন্যায়সঙ্গত ও অংশগ্রহণমূলক হতে হবে। আমাদের ষাট বছরের গণতান্ত্রিক ইতিহাসে ভোটারদের ভোটদানের হার ৫৫৬০ শতাংশ। বিভিন্ন সমাজে ভোটদানের অনীহার তুলনায় এটি ভাল সংখ্যা, তবে আমরা যা অর্জন করতে চাই, তার চেয়ে এ অংশগ্রহণ নিশ্চিতভাবেই অনেক কম।

গণতন্ত্রকে সত্যিকারের অন্তর্ভুক্তিমূলক করবার জন্য আমরা একটি সিস্টেমেটিক ভোটারস এডুকেশন এ- ইলেক্টোরাল পার্টিসিপেশন (এসভিইইপি) উইং নিয়ে এসেছি যা সব নাগরিককে বিশেষ করে যুবসমাজকে নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্য ব্যাপক প্রচার ও মাল্টিমিডিয়া প্রচারণা চালায়। এখন প্রত্যেকটি নির্বাচনে আমরা নাগরিক সমাজ ও গণমাধ্যমের অংশগ্রহণে ভোটার সচেতনতা কর্মসূচি চালুর আগে ভোটারদের জ্ঞানবুদ্ধি, মনোভাব, ব্যবহার ও চর্চার ওপর বৈজ্ঞানিক জরিপ পরিচালনা করি। এই উদ্যোগের সাফল্য কয়েকটি রাজ্য রেকর্ডসহ সাম্প্রতিক বিভিন্ন রাজ্য নির্বাচনে বিপুলসংখ্যক ভোটারের অংশগ্রহণের সাপেক্ষে বহুগুণিত হয়ে ফিরে এসেছে।

এক ঐতিহাসিক ব্যবস্থায় নির্বাচন কমিশন ভোটারদের বিশেষ করে নতুন যোগ্য ভোটারদের তালিকাভুক্ত করার লক্ষ্যে ২৫ জানুয়ারি এর প্রতিষ্ঠা দিবসকে ২০১১ সালে জাতীয় ভোটার দিবস হিসেবে ঘোষণা করে। ১ কোটি ৭০ লাখ নতুন ভোটারকে তালিকাভুক্ত করার পাশাপাশি প্রথম জাতীয় ভোটার দিবসে ৫ লাখের বেশি ভোট কেন্দ্রে ৫২ লাখের বেশি নতুন যোগ্য ও তালিকাভুক্ত ভোটারকে ভোটার কার্ড দেওয়া হয়। বিশ্বের য়ে কোন স্থানের তুলনায় এটি একদিনে যুবসমাজকে ক্ষমতায়িত করার বৃহত্তম অনুশীলন হিসেবে পরিগণিত। এটি এখন ভারতের বাৎসরিক ঘটনা। অনেক দেশ এ মডেল গ্রহণে আগ্রহ দেখিয়েছে।

এটা ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন হয় না যে, ভারতীয় নির্বাচন কমিশনের জ্ঞান, দক্ষতা ও বিশেষ পারদর্শিতা ভাগ করে নিতে বিশ্বের বহু গণতন্ত্রকাঙ্ক্ষী দেশ উন্মুখ হয়ে আছে। বৈশ্বিক বিশেষ করে আফ্রোএশীয় দেশসমূহের ক্রমবর্ধমান দাবির প্রতি সাড়া দিয়ে নির্বাচন কমিশন ইন্ডিয়া ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ডেমোক্রেসি এন্ড ইলেকশন ম্যানেজমেন্ট (আইআইডিইএম) নামে একটি প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেছে যা দেশীয় ও আন্তর্জাতিক অংশগ্রহণকারী উভয়ের জন্য নির্বাচন ও

আমরা ভারতে এমন একটা জায়গায় পৌঁছেছি যেখানে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন আর আদৌ কোন খবর নয়। বস্তুত অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন হচ্ছে না, এটিই ব্যতিক্রম। এটিই এর নিজের জনগণ ও জগতবাসীর প্রতি ভারতের অঙ্গীকার।

ভোটাধিকার প্রয়োগ

গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার গুরুত্বপূর্ণ খাতে প্রশিক্ষণদান ও তথ্যভাণ্ডার হিসেবে কাজ করছে। প্রতিষ্ঠার মাত্র দু'বছরের মধ্যে ইনস্টিটিউটটি দেশের হাজার হাজার নেতৃস্থানীয় প্রশিক্ষণার্থী ছাড়াও ৪০টি আফ্রো-এশীয় ও কমনওয়েলথ্ দেশের নির্বাচনব্যবস্থাপকদের প্রশিক্ষণ দিয়েছে। আইআইডিইএম এখন বিশ্বব্যাপী প্রতিনিধিত্বশীল গণতন্ত্রকে সহায়তা দিচ্ছে।

নির্বাচন কমিশনের সাংবিধানিক ম্যান্ডেটের ধরন অনুযায়ী আমাদের আত্মশ্লাঘার অবকাশ নেই। কমিশনের অনেক সংস্কারপ্রস্তাব থাকে যার লক্ষ্য নির্বাচন প্রক্রিয়াকে জঞ্জালমুক্ত করা, যাতে সুশাসন ও দুর্নীতিমুক্ত রাজনীতির ভিত্তি স্থাপন করা যায়। এসব প্রস্তাবের মধ্যে রাজনীতির দুর্বৃত্তায়ন মোকাবিলা, প্রচারণার অর্থশৃঙ্খলা নিরূপণ, রাজনৈতিক দলসমূহের অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্র প্রভৃতি বিষয় রয়েছে।

আমরা ভারতে এমন একটা জায়গায় পৌঁছেছি যেখানে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন আর আদৌ কোন খবর নয়। বস্তুত অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন হচ্ছে না, এটিই ব্যতিক্রম। এটিই এর নিজের জনগণ ও জগতবাসীর প্রতি ভারতের অঙ্গীকার। নির্বাচনে অর্থশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধে কোন ছাড় নেই। অন্য লক্ষ্য হচ্ছে, প্রত্যেকটি যোগ্য ভারতীয়কে ভোটারতালিকাভুক্ত করা এবং প্রতিটি ভোটারকে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করানো। নির্বাচন কমিশনের দর্শন হচ্ছে: নির্বাচন হবে সুচারু নির্বাচনী ভূমিকার ওপর ভিত্তি করে অপরাধ ও অর্থের অপব্যবহারমুক্ত এবং ভোটারদের পূর্ণ অংশগ্রহণমূলক। এই পথে আমাদের অগ্রগতি নিশ্চিত ও বিরামহীন।

এস ওয়াই কুরেশি
ভারতের প্রাক্তন প্রধান নির্বাচন কমিশনার

ভারত সম্পর্কে নিয়মিত জানতে লাইক ও ভিজিট করুন আমাদের page: High Commission of India, Dhaka

প্রবন্ধ

রবীন্দ্র মনন ও সাহিত্যে ঠাকুরবাড়ির নারীরা

ড. ফেরদৌসী হক

বিশ্ব সংস্কৃতির সুদীর্ঘ ধারায় রবীন্দ্রনাথ এক বিস্ময়কর প্রতিভা। উনিশ শতকের রেনেসাঁর স্বর্ণোজ্জ্বল প্রভায় আলোকিত হয়ে উঠেছিল রবীন্দ্রনাথের জন্মস্থান জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি। এ পরিবারটি নিয়ে গভীর অনুসন্ধিৎসা, চলছে নিরন্তর অন্বেষণ। আবিষ্কৃত হচ্ছে নতুন নতুন তথ্য, কখনও বা উদ্ভাসিত হচ্ছে লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকা কীর্তিমান কেউ। একই পরিবারে এত প্রতিভাধর ব্যক্তিত্ব বিশ্ব সাহিত্যে বিরল। শুধু শিল্প-সাহিত্যে নয়– কারও কারও সমাজ জীবনেও রয়েছে প্রভূত অবদান। উনিশ শতকে বাংলার নবজাগরণের ইতিহাসে নারী উন্মেষের যে অধ্যায়টি রচিত হয়েছিল, তাতে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির অবদান সবচেয়ে বেশি। ঘেরাটোপের রহস্য ছিঁড়ে, রক্ষণশীল সমাজের রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে, ঠাকুরবাড়ির মেয়েরা জীবনচর্চার সমস্ত ধারায় যেভাবে নিজেদের নিয়োজিত করেছিলেন, তা যেমন চমকপ্রদ তেমনিই বিস্ময়কর।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর পুত্র-কন্যাদের ব্যাপারে যথেষ্ট দায়িত্বশীল ছিলেন। কন্যা স্বর্ণকুমারী দেবীর বিজ্ঞানশিক্ষা, জ্যোতির্বিজ্ঞানের প্রথম পাঠ মহর্ষির কাছেই হয়েছিল। মহর্ষির কন্যাদের মধ্যে সৌদামিনী দেবী বেথুন স্কুলে গিয়ে লেখাপড়া শিখেছেন। অন্য মেয়েরা অবশ্য স্কুলে যাননি, বাড়িতেই পড়াশুনা করেছেন। শুধু কন্যাদের জন্য নয়, বিদ্যাচর্চার ব্যবস্থা হয়েছে বাড়ির বধূদের জন্যেও। স্বর্ণকুমারী দেবী তাঁর 'আমাদের গৃহে অন্তঃপুর শিক্ষা ও তাহার সংস্কার' প্রবন্ধে লিখেছেন: 'আমি শৈশবে অন্তঃপুরে সকলেরই লেখাপড়ার প্রতি একটা অনুরাগ দেখিয়াছি। মাতাঠাকুরাণী ত কাজকর্মের অবসরে সারাদিনই একখানি বই হাতে লইয়া

থাকিতেন।' পড়াশুনার এই পরিবেশ সহসা তৈরি হয়নি। এ ব্যাপারে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের উজ্জ্বল ভূমিকা রয়েছে। শুধু বিদ্যাচর্চায় নয়, নারীদের সার্বিক উন্নতি চেয়েছিলেন তিনি। ফলে বঙ্গনারীকে উত্তরণের পথ দেখিয়েছে এ পরিবারটি, নারীকে আধুনিকতার
অভিমুখে ধাবিত করেছেন ঠাকুরবাড়ির মেয়েরা।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর উপন্যাসে সমাজে নারীত্বের আবরণে আচ্ছাদিত নারীপ্রতিমাকে যেমন তুলে ধরেছেন, তেমনি তাদের বিপরীতে দাঁড় করিয়েছেন স্বনির্ভর ব্যক্তিনারীদের এবং তাদের মধ্যে দিয়ে ইঙ্গিত দিয়েছেন ভবিষ্যৎ মানবীদের আগমনের। ঠাকুরবাড়ির নারীদের মধ্যে এই বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়েছে জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর আচার-আচরণে। তিনি ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দে তিনটি শিশুসন্তানসহ অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় একা জাহাজে করে ইংল্যান্ড যাত্রা করেন। তিনি ঠাকুরবাড়ির মেয়েমহলে আধুনিকতার আলো জ্বেলেছিলেন, বাংলার নারীসমাজকেও তিনি রেনেসাঁর আলোকোজ্জ্বল অভিমুখে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিলেন। জ্ঞানদানন্দিনী দেবী ছিলেন সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রবল অনুরাগিণী। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে নাটক করেছেন তিনি। ঠাকুরবাড়ির কিশোর লেখকদের উৎসাহিত করতে প্রকাশ করেছিলেন *বালক* পত্রিকা। বাড়ির ছোটরা তো লিখতেন, রবীন্দ্রনাথও এ পত্রিকায় প্রচুর লিখেছেন। জ্ঞানদানন্দিনী দেবী নিজেও লেখালেখিতে অভ্যস্ত ছিলেন। তাঁর লেখা প্রবন্ধ, গল্পের অনুবাদ, নাটক, প্রকাশিত হত *ভারতী* পত্রিকায়। রূপকথার মায়াবি কাহিনি কথ্য ভাষায় হৃদয়গ্রাহী হয়ে উঠেছে জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর কলমে।

উনিশ শতকের শেষ এবং বিশ শতকের প্রথমার্ধ বাঙালির সচেতন সত্তার টানাপোড়েনের কাল। একদিকে যেমন দেখা যায় সামাজিক বন্ধনমুক্তির প্রয়াস, অন্যদিকে প্রবল পিছুটান। এই টানাপোড়েন ও দ্বন্দ্বের প্রতিফলন ঘটেছিল সমকালীন সাহিত্যে। জীবনের সকল সমস্যাই ব্যক্তিগত, আর ব্যক্তি যেহেতু সামাজিক মানুষও, তার সহজ প্রকাশের গভীরে পরিপার্শ্বগত জীবনের বিপক্ষে এমন একটি মাত্রা যোজনা করে যা সার্বজনীন না হলেও সর্বজন-সংবেদী হতে সক্ষম। ব্যক্তি এবং তার পারিপার্শ্বিক জীবনের টানাপোড়েনে গড়ে ওঠে তার অন্তঃসত্তা। আত্মিক দীনতা থেকে উত্তরণের পথে নিজেকে নিয়ে যাওয়া ব্যক্তিত্বের বিবর্তনের ইঙ্গিত। আত্মনির্মিতির জটিল আবর্তে ব্যক্তি প্রতিদিনের তুচ্ছ দীনতার আবরণ থেকে মুক্ত হয়ে আত্মস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। যার প্রতিচ্ছবি স্বর্ণকুমারী দেবী। মহর্ষির কন্যাদের মধ্যে তিনি সবচেয়ে দীপ্যময়ী। উত্তরজীবনে কবি, ঔপন্যাসিক, গীতিকার, পত্রিকার সম্পাদক, সমাজসেবিকা ও প্রখর ব্যক্তিত্বের অধিকারিণী হয়ে খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন। মেয়েরা কেউ কেউ যখন কিছু করবার কথা ভাবছেন, তখন স্বর্ণকুমারী দেবী এসেছেন একেবারে ঝোড়ো হাওয়ার মত। গল্প উপন্যাস ছাড়াও তিনি লিখেছেন কবিতা, প্রবন্ধ, নাটক, এমনকি ছোটদের লেখাও। পত্রিকা সম্পাদনাতেও প্রশ্নাতীত সাফল্য অর্জন করেছিলেন। *ভারতী* সম্পাদনা করেছেন প্রথম দশ বছর, পরে আরও ছয় বছর। বহু লেখাই লিখেছেন তিনি *ভারতী*র প্রয়োজনে। *দীপনির্বাণ, ছিন্নমুকুল, মিবাররাজ, হুগলির ইমামবাড়ি, বিদ্রোহ, স্নেহলতা বা পালিতা, ফুলের মালা, কাহাকে, বিচিত্রা, স্বপ্নবাণী* ও *মিলনরাত্রি*– সব মিলিয়ে তাঁর এগারটি উপন্যাস গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছিল। এর বাইরেও রয়েছে বেশ কয়েকটি গল্পের বই, নাটক, রবীন্দ্রনাথকে উৎসর্গীকৃত কবিতার বই, গাথা, স্বরলিপি সংবলিত গানের বই, বিজ্ঞানের বই, এমনকি পাঠ্যপুস্তকও। ছোটদের জন্য *গল্পসল্প* যেমন লিখেছিলেন, তেমনিই লিখেছিলেন *প্রথম পাঠ ব্যাকরণ* বা *সচিত্র বর্ণবোধ*।

আত্মনির্মিতির জটিল প্রক্রিয়াতে ঘটে ব্যক্তির সঙ্গে সমাজ তথা সংস্কার-আচার-রীতির সংঘাত। ব্যক্তি সামাজিক প্রক্রিয়াকে সংস্কার, রীতি ইত্যাদি স্বীকার করে নিলেও একান্ত আপনার মুখোমুখি নির্জনতায় তার বোধের বিপ্রতীপেই অনেকক্ষেত্রে অবস্থান তার সামাজিক 'আমি'র। এবং এরই নিরন্তর সংঘাতে ব্যক্তি কখনও ক্লান্ত কখনও বা প্রতিবাদী, আবার কখনও বা হৃদয়ে উত্তাল সমুদ্রের ঢেউ গোপন রেখে বাইরে শান্তভাবে বয়ে চলে। বাল্যে রবীন্দ্রনাথের পারিবারিক পরিমণ্ডলে তিনি যে বোন এবং বউদিদের সাহচর্যে এসেছিলেন তাঁরা সবাই ছিলেন উদার ও সংস্কৃতিমনা। জ্ঞানদানন্দিনী দেবী যেমন তাঁর সামনে নারী স্বাধীনতার প্রত্যক্ষ উদাহরণ ছিলেন, তেমনি সাহিত্যানুরাগী হিসেবে দেখেছিলেন বোন স্বর্ণকুমারী এবং আরেক বউদি কাদম্বরী দেবীকে। রবীন্দ্রনাথের জীবনে কাদম্বরী দেবীর প্রভাব অসীম। এই 'বধূ ঠাকুরানীর সাহিত্যবোধ সেকালের বাংলা সাহিত্যের লেখক অনুরাগীদের মধ্যেও অসাধারণ ছিল। 'স্বপ্নপ্রয়াণ' তাঁর ভালো লাগত, বিহারীলাল চক্রবর্তীর কবিতাও ভালো লাগত।' সাহিত্য রচনায় বউদির উৎসাহ এবং মতামতকে কিশোর রবীন্দ্রনাথ খুবই গুরুত্ব দিতেন।

ব্যক্তির আত্মিক চাহিদার কাছে সব রকম সামাজিক ও তথাকথিত নৈতিক চাহিদা হয়ে পড়ে গৌণ। ব্যক্তি সমাজকে মেনে চলে ততক্ষণ, যতক্ষণ তার আত্মিক চাহিদার সঙ্গে সত্তার কোন যোগ থাকে না। সামাজিক দৃঢ় বন্ধনের অন্তঃশীল শিথিলতা অসহায়ভাবে ধরা পড়ে ব্যক্তির নিজস্ব ইচ্ছার কাছে। সামাজিক আচার-আচরণ যখন ব্যক্তির সচেতন বুদ্ধি সর্বস্ব ইচ্ছায় আঘাত করে তখনই ব্যক্তি সময়ের মুখোমুখি দাঁড়ায়। ব্যক্তি 'আমি' তখন গোষ্ঠী 'আমরা' থেকে পৃথক হয়ে পড়ে। সামাজিক অচলায়তন ভেঙে পড়ে ব্যক্তির সচেতন আত্মজিজ্ঞাসার কাছে। ব্যক্তির আত্মজিজ্ঞাসাই অপরতার দর্পণে নিজেকে আবিষ্কার করতে সচেষ্ট হয় সচেতনভাবে বা অবচেতনে। ব্যক্তির আত্মিক জিজ্ঞাসা চেতনার অন্তর্লীন ধারায় অন্তর্ঘাত করে বাইরের রূপ প্রাপ্ত হয়। সামাজিক আচার-আচরণের প্রতিবাস্তবতার মধ্যেই বাস্তবতার সত্য স্বরূপ ব্যক্তি খুঁজে নেয়। ঠাকুরবাড়ির সরলা দেবীর

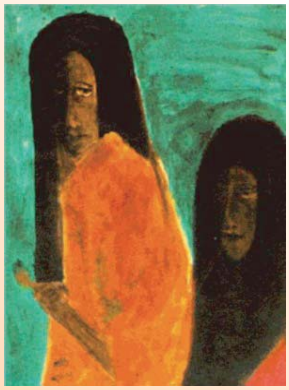

মাঝে আমরা দেখতে পাই সেই মানবীকে, সরলার মত তেজস্বিনী নারী বিরল। স্বর্ণকুমারী দেবীর মধ্যে যে রাজনৈতিক চেতনা ও দেশভক্তির উন্মেষ দেখা দিয়েছিল, তার পূর্ণ বিকাশ ঘটল তার মেয়ে সরলার মধ্যে।

ঠাকুরবাড়ির মেয়েদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম চাকরি করতে বাইরে যান। সরলা দেবী ও তার বড়বোন হিরণ্ময়ী দেবী *ভারতী* পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন। পত্রিকার প্রয়োজনে সরলা দেবীকে প্রচুর লিখতে হয়েছে, গল্প উপন্যাস আর রম্যরচনা। পত্রিকার প্রয়োজনে সমালোচনাও করতে হয়েছে, করতে হয়েছে অনুবাদ। এ ছাড়াও লিখেছেন গান ও কবিতা। এতসব লেখার মধ্যে তাঁর সেরা লেখা বা বই কোনটি, প্রশ্ন করলে সকলেই সম্ভবত *জীবনের ঝরাপাতা* বইটির কথা বলবেন। সুখপাঠ্য বইটির পরতে পরতে ছড়িয়ে আছে ঠাকুরবাড়ি সম্পর্কিত নানা তথ্য। বইটি পড়লে ঠাকুরবাড়ি সম্পর্কে যেমন জানা যায়, তেমনি সমকালীন ঘটনাবলি সম্পর্কেও বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায়। সরলা দেবী *ভারতী* পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন দু'পর্বে। তাঁর সম্পাদনায় *ভারতী* দীপ্তিময় হয়ে সুকুমার সাহিত্যের রঙ্গভূমিই শুধু হয়ে ওঠেনি, হয়েছিল জাতীয়তার বাহন। সরলা দেবীর সহযাত্রী হন ইন্দিরা দেবী,তিনি মৌলিক লেখা সেভাবে লেখেননি। সঙ্গীতে তাঁর প্রবল অনুরাগ ছিল। পরম মমতায় রবীন্দ্রসঙ্গীতের স্বরলিপি তৈরি করেছেন তিনি। সঙ্গীতবিষয়ক প্রবন্ধ লিখেছেন, এ সম্পর্কিত বইও রয়েছে তাঁর, *রবীন্দ্র সঙ্গীতের ত্রিবেণী সংগম* রবীন্দ্রসঙ্গীতের একটি দিকদর্শক। তিনখণ্ডে প্রকাশিত তাঁর স্মৃতিকথা জাতীয় রচনাসমূহ *স্মৃতিসম্পুট* নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। ইন্দিরা দেবীর স্মৃতিকথাগুলো সুখপাঠ্য গদ্যছন্দে লিখিত। সাবলীল স্বচ্ছন্দ তিনি অনুবাদ সাহিত্যেও। ফরাসি সাহিত্য অনুবাদ করে তিনি তুলে দিয়েছিলেন বাঙালি পাঠকের হাতে। রবীন্দ্রনাথের লেখা ইংরেজিতে অনুবাদ করেছেন। পিতা সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে অনুবাদ করেছেন মহর্ষির আত্মজীবনী *দি অটোবায়োগ্রাফি অফ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ টেগোর*। ইন্দিরা দেবী ১৮৯২ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পদ্মাবতী স্বর্ণপদক লাভ করেন। ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে তিনিই প্রথম স্থান অধিকার করেন। ইন্দিরা দেবীর দেখানো পথ বেয়ে এগিয়ে চলেন প্রতিভা, প্রজ্ঞা, হিরন্ময়ী, মনীষা, সুষমা, সুদক্ষিণা দেবীরা। প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী পারিবারিক *পুণ্য* পত্রিকা সম্পাদনা করতেন। ঠাকুরবাড়ির সদস্যদের সাহিত্যচর্চার বাহন হিসেবে পরিগণিত হয়েছিল পত্রিকাটি। প্রজ্ঞা দেবী তিন বছর পত্রিকাটি সম্পাদনা করেন। প্রজ্ঞা-শোভনাসুন্দরী দেবীরা মন দিয়েছিলেন কেউ অনুবাদ সাহিত্যে, কেউ মৌলিক রচনায়।

জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর পুত্রবধূ সংজ্ঞা দেবীও বিদেশি গল্প অনুবাদ করেছেন। ঠাকুরবাড়ির বধূ-কন্যাদের অনুবাদ সাহিত্যের প্রতি গভীর অনুরাগ ছিল। আন্তর্জাতিক সাহিত্য-সংস্কৃতি অঙ্গনের জ্ঞান ছিল তাদের। রবীন্দ্র-কন্যা মাধুরীলতার লেখার হাত ছিল চমৎকার। সম্ভাবনাময়ী ছিলেন তিনি, স্বচ্ছন্দ গদ্যভাষায় লিখতে পারতেন, কিন্তু লিখতেন না। রবীন্দ্রনাথের পুত্রবধূ প্রতিমা দেবীর সম্পর্কেও একই কথা বলা চলে, তার লেখা *স্মৃতিচিত্র* নিঃসন্দেহে অতুলনীয়। গল্প লেখার ক্ষেত্রেও সক্ষমতার পরিচয় দিয়েছিলেন, কিন্তু যৎসামান্যই লিখেছেন তিনি। ঠাকুরবাড়ির কন্যা-বধূদের লেখায় প্রগতিশীল মনের পরিচয় ফুটে উঠেছে। সমাজের কেন্দ্র থেকে এই আত্মানুসন্ধানের সূচনা এবং পরিক্রমা একদেশদর্শী সমাজের বিপ্রতীপে। রবীন্দ্রনাথ এ সম্পর্কে বলেছেন যে, 'সুপ্তি যখন আবিষ্ট করে তখনই চুরি যাবার সময়। অন্তরের মধ্যে যখন অসারতা, বাইরের বিপদ তখনই প্রবল। চিত্তের মধ্যে যার স্বাধীনতা নেই বাইরের দিক থেকে সে কখনোই স্বাধীন হতে পারে না। অন্তরের দিকে সব কিছুকে যে অবিসম্বাদে মেনে নেয়, বাইরে অন্যায় প্রভুত্বকেও মানবার শক্তি তার থাকে না– যে বুদ্ধি অসত্যকে ঠেকায় মনে, সেই বুদ্ধিই অমঙ্গলকে ঠেকায় বহিঃসংসারে। নির্জীব মন অন্তরে-বাহিরে কোনো আক্রমণকেই ঠেকাতে পারে না।' ব্যক্তিগত সম্পর্কের মূল ভিত্তি অন্তরের যোগাযোগ। বহির্যোগাযোগে ব্যক্তি ছকে-বাঁধা পথে নিয়ম মেনে চলে পুতুলের মত। অন্তরের যোগাযোগে ব্যক্তি পূর্ণ প্রাণশক্তি নিয়ে চলে গন্তব্যের দিকে। প্রথম অবস্থায় বেঁচে থাকা মৃত্যুর নামান্তর। দ্বিতীয় অবস্থায় বেঁচে থাকা জীবনের দ্যোতক। এই চলার ছন্দে যেন উপনিষদের 'চরৈবেতি'র ধ্বনি মিলিত হয়। *বলাকাতে* রবীন্দ্রনাথ যে গতিতত্ত্বের কথা বলেছিলেন তারই সঙ্গে যেন অন্তর্লীনভাবে মিশে আছে ব্যক্তি ও জগতের অন্তরের যোগাযোগ। ব্যক্তির সঙ্গে জগতের যোগাযোগ তখনই সম্ভব হয়ে ওঠে যখন ব্যক্তির ব্যক্তিগত সম্পর্ক আত্মিক যোগাযোগের দৃঢ় ভিত্তিতে গড়ে ওঠে। সে তখন তাঁর 'আমি'কে বিস্তার করতে পারে জীবনের গতির সঙ্গে। তাইতো নিউইয়র্কের এক সভায়, ঠাকুরবাড়ির মেয়ে সুষমা দেবী রক্তলাল শাড়ি পরে দৃপ্ত ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়িয়ে সন্ধ্যাতারার মত দু'টি উজ্জ্বল চোখ তুলে যখন বললেন:

Your idea of marriage, companionate marriage and love seems very strange to us. Your divorces startle us. We believe in the holiness of marriage. Considering it a sacred and divine union of two souls.

গুঞ্জন উঠল, সে কী! এতদিন যে আমরা শুনেছি ভারতের মেয়েরা পুরুষের হাতের পুতুল! আর তাদের সম্মান? সে তো নেই বললেই চলে। বিদেশিনীদের কথার উত্তরে সুষমা তাদের বললেন: এই যে আমি এত দূরে এসেছি, বাড়ি থেকে চৌদ্দ হাজার মাইল দূরে! স্বামীর ওপর প্রভাব বিস্তার করবার ক্ষমতা না থাকলে পারতাম কী?

ড. ফেরদৌসী হক শিক্ষাবিদ, প্রাবন্ধিক

জীবাণু থেকে সুরক্ষায়
ডেটল গোসল প্রতিদিন!

Dettol

BE 100% SURE

বেছে নিন আপনার পছন্দের ডেটল সাবান

*BPMPA

ডাক্তারদের দ্বারা স্বীকৃত
বাংলাদেশের একমাত্র সাবান

www.dettol.com.bd
facebook.com/dettolbd

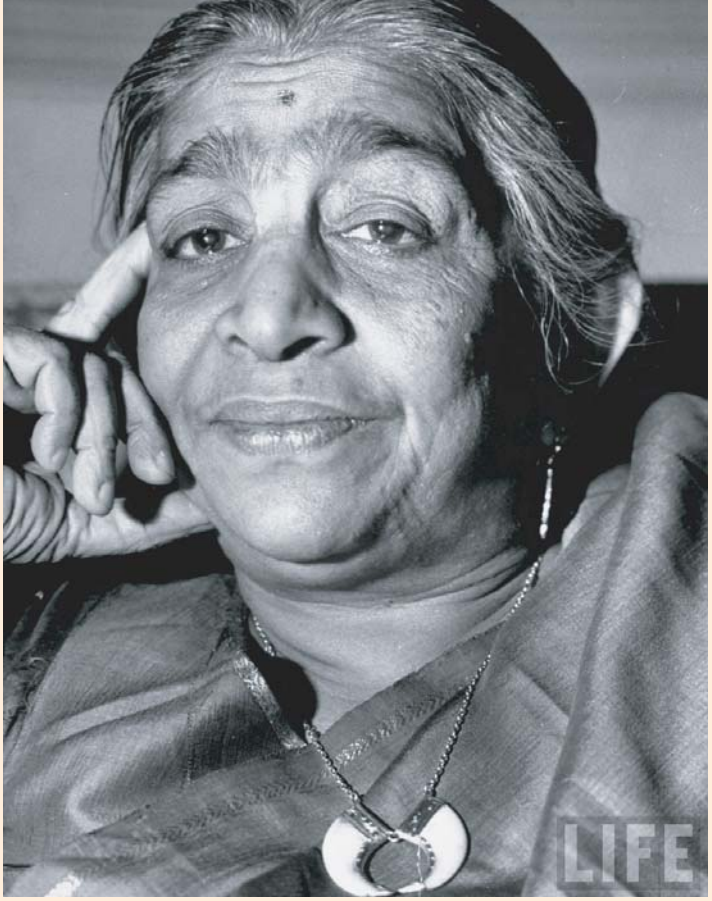

স্মরণ

সরোজিনী নাইডুর জীবন ও কবিতা

হেলাল উদ্দিন আহমেদ

১৯০৫ থেকে ১৯১৭ সালের মধ্যে ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত তিনটি শীর্ণকায় কাব্যগ্রন্থের জন্য বাঙালি কবি ও পরবর্তীকালে ভারতীয় জাতীয়তাবাদী নেত্রী সরোজিনী নাইডু বিলেতে ব্যাপক খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। সরোজিনী চট্টোপাধ্যায় (পরে নাইডু) ১৮৭৯ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি এক বাঙালি কুলীন ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর আদিনিবাস ছিল ঢাকার বিক্রমপুর মহকুমার ব্রাহ্মণগাঁও গ্রামে। সংস্কৃত শিক্ষায় পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান এবং যোগব্যায়াম চর্চার জন্য সরোজিনীর পূর্বপুরুষদের পূর্ববঙ্গব্যাপী খ্যাতি ছিল। তাঁর পিতা প্রখ্যাত রসায়নবিদ ও দার্শনিক অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় যুক্তরাজ্যের এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচ ডি ডিগ্রিলাভের পর হায়দ্রাবাদ রাজ্যে বসতি স্থাপন করেন। এখানে তিনি নিজাম কলেজ প্রতিষ্ঠা করে আজীবন শিক্ষাবিস্তারের লক্ষ্যে তাঁর প্রয়াস অব্যাহত রাখেন। সরোজিনীর মাতা বরদাসুন্দরী দেবী বাংলা কবিতা লিখে পূর্ববঙ্গে নাম কুড়িয়েছিলেন।

সরোজিনী ছিলেন তাঁর আট ভাই-বোনের মধ্যে জ্যেষ্ঠতমা। পারিবারিক রীতি অনুযায়ী অল্পবয়সেই তিনি ইংরেজিতে পারদর্শী হয়ে ওঠেন। মাত্র ১২ বছর বয়সে কৃতিত্বের সঙ্গে এন্ট্রান্স পরীক্ষা পাশ করে তিনি ভারতজোড়া খ্যাতি অর্জন করেন। এরপর মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত অবস্থায় ১৫ বছর বয়সে তিনি ডা. মুথিয়ালা গোবিন্দ রাজুলু নাইডুর সঙ্গে পরিচিত হন ও তাঁর প্রেমে পড়ে যান। তবে পরিবারের কাছে তা গ্রহণযোগ্য না হওয়ায় ১৮৯৬ সালে মাত্র ১৬ বছর বয়সে তিনি নিজামের বৃত্তি নিয়ে পড়াশোনার জন্য বিলেত গমন

করেন। সেখানে অক্সফোর্ডের কিংস কলেজ এবং কেমব্রিজের গার্টন কলেজে দুই বছর অধ্যয়নের পর তিনি ইতালি হয়ে ১৮৯৮ সালে আবার স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন। একই বছর পরিবারের আপত্তি সত্তেও সরোজিনী তাঁর ভালবাসার পাত্র নিম্নবর্ণের হিন্দু চিকিৎসক ডা. মুথিয়ালা নাইডুর সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। সেসময় আন্তঃবর্ণ বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল এবং এ ঘটনা তখনকার গোঁড়া হিন্দুসমাজে প্রচুর বিতর্কের জন্ম দিয়েছিল। কিন্তু ব্রাহ্ম বিবাহ আইন (১৮৭২) অনুযায়ী মাদ্রাজে সম্পাদিত এ বিয়ে শেষপর্যন্ত 'হ্যাপি ম্যারিয়েজ'-এ পর্যবসিত হয়।

সরোজিনীর গর্ভে দুই পুত্র ও দুই কন্যাসন্তান জন্মগ্রহণ করে। মুসলিম নিজামের অধীনস্থ এবং ইসলামী সংস্কৃতি-প্রভাবিত একটি রাজ্যে জন্মানোর ফলে সরোজিনীর কবিতায় ইসলামী ঐতিহ্যের প্রয়োগ দেখতে পাওয়া যায়। এই একই কারণে রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও হিন্দু-মুসলিম সংঘাত নিরসনে তিনি মূল্যবান ভূমিকা রাখতে সক্ষম হন।

তবে ভারতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের তুখোড় নেত্রী হিসেবেই সরোজিনী নাইডুর খ্যাতি চিরস্থায়ী হয়ে থাকবে। রাজনৈতিক সম্পৃক্ততার কারণে তাঁর কাব্যও বাঙ্ময় হয়ে উঠেছিল। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের পক্ষে ক্ষুরধার বক্তৃতার মাধ্যমে তিনি দেশী-বিদেশী শ্রোতাদের আলোড়িত করতে পারতেন। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের পর তিনি প্রথম ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েন। এসময় তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও গোপালকৃষ্ণ গোখলের মত ব্যক্তিত্বের সঙ্গে পরিচিত হন। ১৯১৪ সালে লন্ডনে মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে। এরপর তিনি গান্ধীর একনিষ্ঠ সহচরে পরিণত হন। তিনি ছিলেন 'উওমেনস ইন্ডিয়া' সমিতির প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। এই ফোরামে তিনি মার্গারেট কাজিনস ও অ্যানি বেসান্ত-এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করেন।

একই সময়ে সরোজিনী নাইডু ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসে তাঁর রাজনৈতিক তৎপরতার বিস্তত্বার ঘটান। ১৯২৫ সালে তিনি এই সংগঠনের প্রথম নারী সভানেত্রী নির্বাচিত হন। স্বাধীনতা আন্দোলন চলাকালে তাঁকে পাঁচ পাঁচবার কারাবরণ করতে হয়। দক্ষিণ আফ্রিকা সরকারের দমননীতির বিরুদ্ধে স্থানীয় ভারতীয়দের সহায়তা করতে মহাত্মা গান্ধী তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে সরোজিনীকে দক্ষিণ আফ্রিকা প্রেরণ করেছিলেন। ক্যাথারিন মেয়ো'র সাড়াজাগানো গ্রন্থ *মাদার ইন্ডিয়া* যুক্তরাষ্ট্রে যে অপপ্রচারের জন্ম দিয়েছিল, তা খণ্ডন করতেও মহাত্মা গান্ধী তাঁকে যুক্তরাষ্ট্রে পাঠিয়েছিলেন। মুসলিম লিগের সঙ্গে বিবাদ নিরসনে কংগ্রেস প্রায়শই সরোজিনীর দ্বারস্থ হত। পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর সঙ্গে তাঁর চিরকালই বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছিল। ১৯৪৭ সালে ভারত-বিভাগের পর সরোজিনী উত্তর প্রদেশ রাজ্যের প্রথম গভর্নর নিযুক্ত হন। ১৯৪৯ সালের ২ মার্চ প্রদেশের রাজধানী লক্ষ্মৌতে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর জন্মদিন ভারতে 'নারী-দিবস' হিসেবে উদ্‌যাপিত হয়।

কাব্যপ্রতিভা

ইংল্যান্ডে অবস্থানকালে সরোজিনী নাইডু দু'জন বিখ্যাত সাহিত্য সমালোচক আর্থার সিমন্স ও এডম- গোস-এর সান্নিধ্যলাভ করেছিলেন। তাঁর প্রথম দিককার কবিতা পড়ার সৌভাগ্য হয়েছিল গোস-এর। তিনি সেগুলোকে 'আকারে দক্ষ, ব্যাকরণে সঠিক এবং আবেগে নিখুঁত' হিসেবে বর্ণনা করেছিলেন। তবে তাঁর কাছে সেগুলোকে অনুভূতি ও চিত্রকল্পের দিক দিয়ে পশ্চিমা ধাঁচের মনে হয়েছিল। তিনি সরোজিনীকে উপদেশ দিয়েছিলেন, 'কবিতাগুলোকে পর্বত, উদ্যান ও উপাসনালয়ে শক্তভাবে স্থাপন করতে, এবং তাঁর নিজ রাজ্যের জীবন্ত জনগোষ্ঠীকে কবিতার মাধ্যমে পরিচয় করিয়ে দিতে'।

এতে কোন সন্দেহ নেই যে সরোজিনী নাইডু তাঁর কাব্যে এই পরিবর্তনগুলো এনেছিলেন। কিন্তু 'এক বুদ্ধিমতী কোমল হৃদয়ের ভিক্টোরিয়ান তরুণী– যিনি টেনিসন, শেলী এবং এলিজাবেথ ব্যারেট ব্রাউনিং দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত', সেটা তাঁর কবিতায় অব্যাহতভাবেই প্রতিভাত হয়েছিল। তিনি বিলেতে প্রচুর খ্যাতি ও স্বীকৃতি অর্জন করেছিলেন এবং 'প্রাচ্যের নাইটিঙ্গেল' খেতাবটিও তাঁকে সেখান থেকেই প্রদান করা হয়।

সৌহার্দ সম্প্রীতি ও মৈত্রীর সেতুবন্ধ

ভারত বিচিত্রা

ভারতে শিক্ষাপ্রাপ্ত প্রাক্তন ছাত্রদের প্রতি আবেদন

ভারত বিচিত্রার পক্ষ থেকে ভারতে শিক্ষাপ্রাপ্ত বাংলাদেশ ছাত্র সমিতি (Association of Bangladesh Students Studied in India- ABSSI)-র সদস্যসহ ভারতের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষাপ্রাপ্ত বাংলাদেশী প্রাক্তন ছাত্রদের নিয়মিত স্বল্পদৈর্ঘ্য রচনা ও মতামত পাঠানোর আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে। এখন থেকে *ভারত বিচিত্রার* এক পৃষ্ঠায় এইসব লেখা নিয়মিতভাবে ছাপা হবে। এই উদ্যোগের মাধ্যমে *ভারত বিচিত্রা* আইসিসিআর-বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্রসহ ভারতের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষাপ্রাপ্ত প্রাক্তন ছাত্রদের মধ্যে একটি সেতুবন্ধ রচনা করতে আগ্রহী যাতে এবিএসএসআই-এর কর্মকাণ্ড এবং ভারতে তাঁদের অভিজ্ঞতার স্মৃতিচারণ জনসমক্ষে প্রচারিত হয়। এভাবে ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের বিদ্যমান উষ্ণ সম্পর্কে তাঁরা আরো গতিবেগ সঞ্চার করতে পারবেন বলে আমাদের ধারণা।

মাসের প্রথম সপ্তাহে *ভারত বিচিত্রার* ঠিকানায় প্রাপ্ত লেখা পরবর্তী মাসে ছাপার জন্য বিবেচিত হবে।

তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ *দি গোল্ডেন থ্রেশহোল্ড* লন্ডন থেকে প্রকাশিত হয়েছিল ১৯০৫ সালে। এরপর ১৯১২ সালে প্রকাশিত হয় *দি বার্ড অফ টাইম* এবং ১৯১৭ সালে *দি ব্রোকেন উইং*। ১৯১৮ সালে প্রকাশিত হয়েছিল *ফিস্ট অফ ইয়ুথ* গ্রন্থটি। পরবর্তীকালে প্রকাশিত তাঁর আরো তিনটি কাব্যগ্রন্থ ছিল: *দি ম্যাজিক ট্রি*, *দি উইজার্ড মাস্ক* ও *এ ট্রেজারি অফ পোয়েমস*।

নাইডুর কবিতা ছিল গীতধর্মী ও সুরেলা, যা চিত্রকল্পে ভরপুর এবং যাতে বিভিন্ন প্রকার মিটার ও ছন্দের প্রয়োগ ঘটানো হয়েছিল। বিষয়বস্তুর মধ্যে ছিল প্রেম ও মৃত্যু, বিরহ ও কামনা, এবং জীবনরহস্য ও আধ্যাত্মিকতা, যার সবগুলোই কবিতার জন্য গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এগুলোতে ছিল প্রচুর বাকচাতুর্য, আদর্শ অতীত ও আদর্শ প্রেমের কথা, যদিও সময়ে সময়ে তা একঘেয়েমিতেও পরিণত হয়েছে। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সরোজিনীর কবিতার একনিষ্ঠ পাঠক ছিলেন এবং তিনি নিজে কয়েকটি কবিতা ইংরেজি থেকে বাংলায় অনুবাদও করেছিলেন। নীচে বর্তমান লেখকের অনুবাদে সরোজিনী নাইডুর তিনটি কবিতা পত্রস্থ হল:

অনিত্য

না, শোক কোরো না যদিও জীবন দুঃখে ভরা,
তোমার শোকে কিন্তু প্রত্যুষ তার দীপ্তি ঢাকবে না,
বসন্তও তার ঔজ্জ্বল্য হারাবে না, আর পদ্মফুল ও অশোক পাতাকে
প্রস্ফুটিত সৌন্দর্যের অধিকার থেকে বঞ্চিত করবে না।

না, কাতর হয়ো না, যদিও জীবন সমস্যার আঁধারে ছাওয়া,
সময় কিন্তু তার যাত্রাপথে থামবে না বা জমে যাবে না;
আজ যা এত দীর্ঘ, এত অদ্ভুত, এত তিক্ত মনে হয়,
অচিরেই সেগুলো হয়ে যাবে বিস্মৃত অতীত।

না, কেঁদো না; নতুন আশা, নতুন স্বপ্ন, নতুন মুখশ্রী,
আর জন্ম না নেওয়া বছরগুলোর যত অব্যয়িত আনন্দ,
প্রমাণ করবে শোকের সঙ্গে তোমার হৃদয়ের বিশ্বাসঘাতকতা,
আর তোমার চোখ দুটোকে করে তুলবে অশ্রুর প্রতি অবিশ্বাসী।

একটি স্বপ্নের গান

একদা এক রাতে স্বপ্নের ভুবনে
আমি দাঁড়িয়েছিলাম এক যাদুর বনে,
পপিফুলের মত গজিয়ে ওঠা দৃশ্যে অন্তর ছিল নিমগ্ন;
আর সেখানে গায়ক পাখিগুলো ছিল সত্যের আত্মা,
আর উজ্জ্বল তারাগুলো ছিল প্রেমের অন্তর,
আর বহমান নদীগুলো ছিল শান্তির আত্মা,
সেই যাদুর বনে ঘুমের রাজ্যে।

সেই যাদুর কুঞ্জবনের আলোয় একাকী আমি
অনুভব করছিলাম প্রেমের আত্মার নক্ষত্রকে
যারা আমার কোমল যৌবন ঘিরে আলো ছড়াচ্ছিল,
আর আমি সত্যের আত্মার গান শুনছিলাম;
আমি আমার তৃষ্ণা মেটাতে নীচু হয়েছিলাম
শান্তি ও প্রবাহের আত্মার সেই নদীর ধারে,
সেই যে যাদুর বনে ঘুমের দেশে।

হায়দ্রাবাদে রাতের আগমন

দেখ, রঙিন আকাশ কিভাবে পায়রার ঠোঁটের মত জ্বলে
বর্ণিল পাথরের জ্বলন্ত কয়লায় অলংকার হয়ে।

দেখ, সফেদ নদী চকমকিয়ে দ্যুতি ছড়ায়
যেন নগর ফটক থেকে হাতির শুঁড়ের মত বাঁকানো।

শোন, মিনার থেকে কেমন ভেসে আসে মুয়াজ্জিনের আওয়াজ
নগর দেয়ালে তা সমর-পতাকার মত ভেসে বেড়ায়।

মাচার মত ব্যালকনিতে অসাড় ও আলোকিত
মুখগুলো জ্বলে, যেন এক চমৎকার চাদরে ঢাকা।

মন্থর গতিতে হাতিগুলো এগিয়ে চলে আঁকাবাঁকা পথে
রূপার শেকল থেকে ঝোলানো রূপার ঘণ্টা দুলিয়ে দুলিয়ে।

উঁচু চার-মিনার-এর চারিদিকে বাজে উৎসবের ধ্বনি
মন্দিরার বাজনা নিশা-সঙ্গীতের সাথে যায় মিশে।

নগরসেতুর ওপর রাত্রি আসে রাজকীয় মেজাজে
এক জাঁকালো উৎসবে রাণীকে বয়ে নিয়ে যায়।

ড. হেলাল উদ্দিন আহমেদ গবেষক, প্রাবন্ধিক ও অনুবাদক

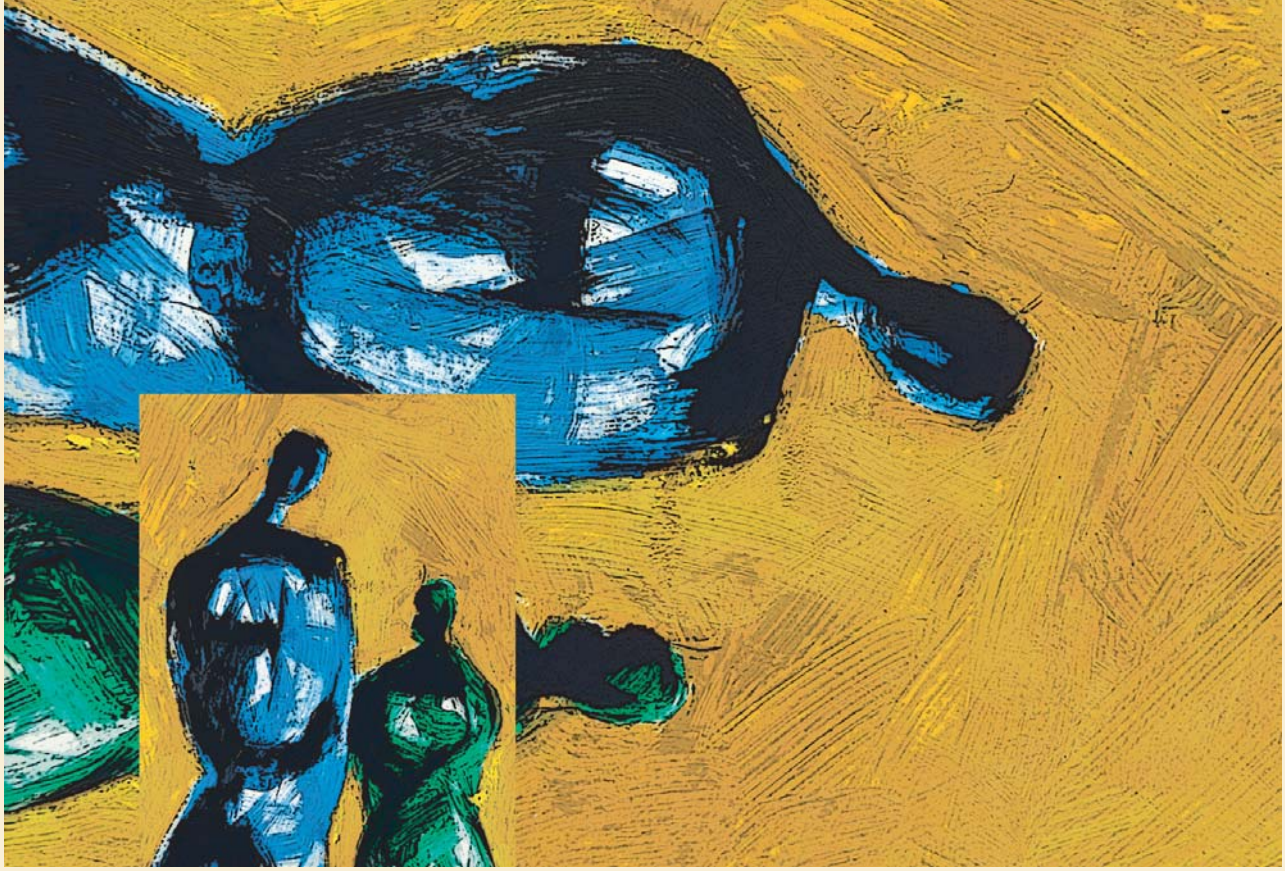

ছোটগল্প

আশীর্বাণী

কৌস্তভ বসু

এক.

পথ চলতে চলতে অনেক মুখ চোখে পড়ে। মন কেবল ধরে রাখে কিছু কথা!

আমাদের রোজকার টক-ঝাল জীবনে, এবড়ো-খেবড়ো কথা দেয়া-নেয়ার ছলে নিজের খেয়ালে এমন কিছু জ্যামিতির জন্ম হয়, অভিধানে যার সঠিক কোন ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া যায় না। চেনা-অচেনার আলোছায়ায় রহস্যের ধূম্রআবর্তে কানামাছি খেলতে খেলতে সম্পর্কের বিন্দুগুলি কখন যে পরস্পরের কাছাকাছি এসে পড়ে, তার হদিস বোঝা রীতিমত কষ্টকর ব্যাপার!

আমাদের গল্পটাও অনেকটা এরকমই। ওকে একদিন সরাসরি জিগ্যেস করেই ফেললাম, আচ্ছা আমাদের সম্পর্কটা ঠিক কী, বলতে পারিস?

ও প্রথমে কোন উত্তর দিল না। খানিক পরে ভেঙে ভেঙে বলল, জানি না। ওর কথায় একটা আত্মবিশ্বাসের অভাব টের পেলাম, 'তবে আমারও মাঝে মাঝে ভাবতে ভারি আশ্চর্য লাগে। যতবারই নিজেকে জিজ্ঞেস করেছি, প্রতিবারই ভেসে উঠেছে অভ্রর মুখ। বুঝেছি, যদি প্রেম, সে অভ্রই। তাহলে তুই? উত্তর পাইনি; আবার কেন জানি তোর থেকে দূরেও সরে যেতে পারিনি'। আমারও একই দশা। তোর কথা উঠলে, মলিকা না থেকেও কিভাবে যেন আমাদের মাঝে ছায়া বিস্তার করে। ওর মুখটা মনে পড়লে মনটা আজও বড় তেতো হয়ে যায়। কলকাতা আর মলিকা আমার নিঃশ্বাস-ধুলোয় মিশে গিয়েছে। কিন্তু এরপরেও, তোর কথা জানতে, তোর গলা শুনতে বড্ড ইচ্ছে করে। কি জানি কেন! আমাদের মধ্যে কি আছে, বলতে পারিস?

আমাদের বিচ্ছেদে আমি যত না ভেঙে পড়েছিলাম, কলিও বুঝি কিছু কম কষ্ট পায়নি। সব চেয়ে যে বিষয়টা ওকে বেশি আঘাত দিয়েছিল, তা হল, আমাদের ভাঙনে নিতান্তই অসহায়ভাবে ও এসে পড়েছে দু'জনের মাঝে। আমার গায়ে যাতে মিথ্যে কালি না লাগে, সেই জন্য মলিকার সঙ্গে নিজে কথা বলতে উদ্যোগী হয়েছিল। চেয়েছিল যাতে আমাদের সম্পর্কটা বেঁচে যায়। ও পারেনি। উপরন্তু অনেক কথা শুনেছিল মলিকার কাছে। কিন্তু এই ঘটনায় আমার ওর প্রতি শ্রদ্ধা দ্বিগুণ বেড়ে গিয়েছিল।

– উঁহু। শুধু জানি, এমন কিছু আছে যার কোন ডেফিনিসন নেই, বা কোন নমেনক্লেচার।

– জানিস, লাস্ট বুধবার আমার কলেজের এক বন্ধু ওর স্ত্রীকে নিয়ে আমার বাড়িতে এসেছিল। আসার সময় ওরা কিছু ক্যালেন্ডুলা কিনে এনেছিল, আমাকে তো জানিসই ভীষণ অগোছালো। ঘরে শখ করে ফুলদানি রাখব এমন শৌখিনতা কোনদিনই নেই। তো ওই ফুলগুলো নিয়ে কি করি! একটা কাচের জাগে জল দিয়ে রেখে দিলাম। ফুলগুলো বেশ কিছুদিন আমার দু'কামরার বেয়াদব-স্বর্গে শোভা বর্ধন করল। ধীরে ধীরে ওদের আয়ু ফুরিয়ে এল, শুকিয়ে নুইয়ে পড়ল। আজ সকালে ওদের ফেলতে গিয়ে হঠাৎ কাচের জাগটার দিকে চোখ পড়ল। একটা ভারি অদ্ভুত জিনিস রিয়ালাইজ করলাম। জাগটার কোনদিন ফুলদানি হবার কথা ছিল না। ক্যালেন্ডুলাগুলিও কখনও ভাবেনি জীবনের শেষ ক'টা দিন ওই জাগের জল খাবে। অথচ ঘটনাচক্রে ওদের মধ্যে কি অদ্ভুত একটা বন্ডিং তৈরি হল ভাব! আমাদের গল্পটাও বোধহয় ওই ক্যালেন্ডুলা আর কাচের জাগের মত।

আমার কথা শুনে ও হেসে উঠল, যা বলেছিস। একটু পরে হাসিটা কেমন মিয়িয়ে গেল; ওর গলায় ঈষৎ অন্যমনস্কতা টের পেলাম, লাইফটা বড্ড একঘেয়ে হয়ে গেছিল। ভীষণ প্যাচপ্যাচে, ফ্যাকাসে, ডাল। এরকম সময় তোর সঙ্গে আলাপ। তুই যেদিন প্রথম 'কলি' বলে ডাকলি, জানিস দেয়ার ওয়াজ সামথিং ভেরি স্পেশাল ইন ইওর ভয়েস!

– তাই বুঝি?

– হ্যাঁ রে! সন্ধ্যেবেলা ঝড় উঠেছিল। তার সঙ্গে ঝমঝমিয়ে নেমে এল বৃষ্টি। মাটির ভেজা দোঁয়াশ গন্ধটা হঠাৎ কেমন নস্টালজিক করে তুলেছিল। তোকে বলিনি, সেদিন নিজে থেকেই আচমকা চোখ দুটো বৃষ্টির জলে ভিজে গিয়েছিল। অভ্রকে ফোন করেছিলাম। বহুদিন পর অনেকক্ষণ আড্ডা দিয়েছিলাম দু'জনে। কথায় কথায় কখন যে অমিত আর লাবণ্যে হারিয়ে গিয়েছিলাম, দুজনের কেউই টের পাইনি। চারপাশের বাস্তুপৃথিবীটা এক নিমেষে অদ্ভুত এক প্যারাডাইস হয়ে উঠেছিল। নিছক কৌতূহলে অভ্রকে জিগ্যেস করেছিলাম, শিলং পাহাড়ে কখনও গেছিস? ও কি বলে জানিস, হ্যাঁ সবাই যখন ঘুমিয়ে পড়ে, চুপি চুপি চাদর জড়িয়ে চলে যাই আকাশের সবথেকে উঁচু তারার সঙ্গে গল্প করব বলে।

– তাই! তুই কি বললি?

– আমিও ছাড়বার পাত্রী নই। বললাম, তুই যখন তারাদের সঙ্গে গল্প করিস, আমি তখন পাহাড়ের কোলে ঘাপটি মেরে বসে থাকি, তোর থেকে ওদের খবর নেব বলে। দু'জনেই হেসে ফেলেছিলাম। আমাদের কল্পকথা সেদিন বাঁধ মানছিল না। এতদিনের ধ্যাত্তেরিকা ক্লান্তির পরে দুই বন্ধুতে কল্পবিলাসী আলাপচারিতায় নিদারুণ মজে গিয়েছিলাম। ফোনটা রাখবার আগে ও আবৃত্তি করেছিল নিবারণ চক্রবর্তী, 'আমরা যাব যেখানে কোনো যায়নি নেয়ে সাহস করি/ ডুবি যদি তো ডুবি না কেন... ডুবুক সবই, ডুবুক তরী'। ওর কণ্ঠস্বরে সেদিন অনেকদিন পর পুরনো অভ্রকে পেয়েছিলাম। গলায় আমার রবি ঠাকুর ভর করেছিলেন, 'খেলাঘর বাঁধতে লেগেছি, আমার মনের ভিতরে'! হ্যাঁ রে, তোর ঐ ডাকে সেদিন কি জাদুমন্ত্র ছিল, বলবি?

আমি মৃদু হেসে বললাম, 'For we are bound where mariner has not yet dared to go, and we will risk the ship, ourselves and all.'

আর বেশি কথা হয়নি। ওর মা খেতে ডাকছিলেন। ফলে সেদিনকার মত আমাদের আলাপের ওখানেই ইতি।

দুই.

কলির সঙ্গে আমার প্রথম দেখা ইয়াহু মেসেঞ্জারে। আসল নাম অবশ্য অন্য একটা ছিল; কিন্তু ওর ভিতর কিভাবে যেন খুঁজে পেয়েছিলাম কলকাতা। অবচেতনে ওকে ডেকে ফেলেছিলাম, 'কলি'! প্রথম প্রথম 'হাইহ ্যালো'... স্বাভাবিক কথাবার্তা, মাঝে মাঝে একটু জড়তার আভাস, হোঁচট... ধীরে ধীরে কবে যে দু'জনে দু'জনের কাছে ধরা পড়ে গেলাম, উভয়ের কাছেই অজানা! আমাদের মধ্যে রোজ যে কথা হত, তা নয়। সত্যি কথা বলতে, বুঝতেও পারলাম না, এটা কি কোন সম্পর্ক নাকি টুকরো টুকরো কিছু আলাপের কোলাজ। পরে অবশ্য অবসরে মুহূর্তগুলো জোড়া লাগিয়ে দেখেছি অ্যালবামটা নিতান্ত নির্জীব নয়!

মলিকার সঙ্গে তখন সম্পর্ক কেটে গিয়েছে। সম্পর্ক ভাঙারই কথা ছিল। নিত্যদিনের ঝগড়াবিবা দে খেয়াল করেছিলাম ভালবাসার তারটা নিতান্তই রুগ্ন হয়ে পড়েছে। তবু সাত পাকে বাঁধার এতদিনের পরিকল্পনা, বাঙালির মন, ছেড়েও ছাড়তে চায় না। একদিন সুরটা খাদে নামতে নামতে কেমন বেসুরো হয়ে গিয়েছিল। এই রকম এক বিষণ্ন রাতে কলির সঙ্গে আমার আলাপ। ফলে যা হবার তাই হল। আর দশজন সন্দেহপ্রবণ মানুষের মত মলিকাও এমন রূপকথার জন্ম দিল, কলির প্রতি আকর্ষণে আমাদের এতদিনের গড়ে তোলা স্বপ্নের বুনিয়াদ ভেঙে গেল। আচ্ছা, প্রেমে পড়লে কি মানুষ বেশি সন্দেহপ্রবণ হয়? যাই হোক, ওকে যেটা কখনই বুঝিয়ে উঠতে পারিনি, একটা দীর্ঘদিনের সম্পর্কের ভিতরে যদি বিন্দুমাত্র প্রাণ বেঁচে থাকে তাহলে অন্য কোন অতিসংক্ষিপ্ত আলাপে তাতে ভাঙন ধরতে পারে না। আমাদের সম্পর্কটায় আর কিছু বেঁচে ছিল না বলেই ওতে দাঁড়ি পড়েছে।

আমাদের বিচ্ছেদে আমি যত না ভেঙে পড়েছিলাম, কলিও বুঝি কিছু কম কষ্ট পায়নি। সব চেয়ে যে বিষয়টা ওকে বেশি আঘাত দিয়েছিল, তা হল, আমাদের ভাঙনে নিতান্তই অসহায়ভাবে ও এসে পড়েছে দু'জনের মাঝে। আমার গায়ে যাতে মিথ্যে কালি না লাগে, সেই জন্য মলিকার সঙ্গে নিজে কথা বলতে উদ্যোগী হয়েছিল। চেয়েছিল যাতে আমাদের সম্পর্কটা বেঁচে যায়। ও পারেনি। উপরন্তু অনেক কথা শুনেছিল মলিকার কাছে। কিন্তু এই ঘটনায় আমার ওর প্রতি শ্রদ্ধা দ্বিগুণ বেড়ে গিয়েছিল। এমন মেয়েও এ পৃথিবীতে আছে? নিজে অকারণ কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে জেনেও ইন্টারনেটের এক বন্ধু যাকে কোনদিন চোখে দেখেনি, তার জন্য সমস্ত আত্মসম্মান বিসর্জন দিয়ে নিতান্ত সম্পর্কটা বাঁচানোর তাগিদে এমন আত্মনিবেদন, আমাকে ওর প্রতি আরও দুর্বল করে তুলেছিল। ভিতরে ভিতরে ওকে একটিবার চাক্ষুস দেখার এক তীব্র বাসনা জন্মেছিল।

একদিন রাখঢাক না করে সোজা বলে ফেললাম, কলকাতা আসছি। আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাই। হ্যাঁ, প্রথম প্রথম আমরা ঠিক বুঝে উঠতে পারতাম না, একেঅপর কে কি বলে সম্বোধন করব, তুমি, না আপনি, না তুই। আর যেহেতু অনেক দিনের অন্তরায়ে বাক্যালাপ হত, ফলে সম্বোধনটি ঠিক দানা বাঁধারও সুযোগ পেত না।

আমার প্রস্তাবে কলি পত্রপাঠ 'না' করে দিল। বলল, আমি চাই না আপনার সঙ্গে কোনরকম যোগাযোগ রাখতে।

আমিও নাছোড়বান্দা। বললাম, ঠিক আছে, রাখতে হবে না। শুধু

একবার আপনাকে দেখতে চাই। আর কখনও বিরক্ত করব না। কথা দিলাম।

কিন্তু কেন, আমাকে দেখে আপনার কি হবে?

দেখুন আপনার কাছে বিষয়টা নিতান্তই মামুলি ঠেকতে পারে কিন্তু আমার কাছে একদমই নয়। আপনি আমার জন্য যা করেছেন, আমি তার জন্য কৃতজ্ঞ। তাই একবার আপনাকে দেখতে চাই। আপনাকে কথা দিচ্ছি আর কখনও এমন বেয়াদব অনুরোধ করব না; আর আমার অন্য কোন অভিসন্ধিও নেই, নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।

এই কথার পরে কলির পক্ষে নিতান্ত মুশকিল ছিল আমাকে ফিরিয়ে দেওয়া।

অতএব একদিন বিকেল চারটের সময় স্থির হল কফি হাউসের সামনে দেখা করব। তবে এর সঙ্গে অত্যন্ত সচেতনভাবে যোগ করল, আমি যেন ওর কলেজের সামনে না দাঁড়াই, কারণ ওর বন্ধুবা ন্ধবেরা কেউ দেখে ফেললে এক নতুন আষাঢ়ে গল্পের জন্ম হতে পারে। বাই দ্য ওয়ে, ও তখন সিইউতে এম কম পড়ছে। আমি যথা আজ্ঞা পালন করলাম। দূর থেকে দেখলাম কফি হাউসের নিচের ফুটপাথে এক তরুণী গেরুয়া সালোয়ার-কামিজে দাঁড়িয়ে। কাঁধে একটা শান্তিনিকেতনী সাইডব্যাগ। চোখের তারায় খানিক চঞ্চলতা (পাছে চেনাজানা কেউ দেখে না ফেলে)! ভিড়ে একমুহূর্ত দেখলে কেউ আলাদা করতে পারবে না। কোন অতিরিক্ত সাজ নেই। কপালে একটা ছোট্ট কুমকুমের ফোঁটা। রঙটা চাপা। চোখে একটা রিমলেস চশমা চেহারায় আলতো গাম্ভীর্য এনেছে। ঘামে ঘাড়ের কাছটা একটু ভিজে, নাকের সামনেও জমে অল্প স্বেদবিন্দু। শান্ত চেহারা। সুন্দরী নয়, তবে সুন্দর।

কফি হাউসের দোতলায় উঠে কোণার দিকে একটা টেবিলে বসে প্রথমেই বললাম, দেখুন আলাপের পূর্বে আমাদের দু'জনের দূরত্বটা ঠিক করে নেওয়া প্রয়োজন।

ও ঠিক বুঝল না। বলা ভাল, আমার কথায় কিছুটা ভ্যাবাচ্যাকাই খেয়ে গেল। ওর মুখে প্রশ্নচিহ্ন দেখে বললাম, ঘাবড়ে যাবেন না। আসলে 'আপনি', 'তুমি' না 'তুই' কি বলে সম্বোধন হবে সেটা বোধহয় ঠিক হওয়া বিশেষ জরুরি।

ও যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। হেসে ফেলল, 'আপনি'টা বড্ড বাবাবাবা টাইপ। 'তুমি'টাও বেশ গুরুগম্ভীর। 'তুই'টা দিব্য! বেশ কাছের।

– তথাস্তু! তাহলে আজ থেকে 'তুই'!

এই শুরু। আলাপচারিতা বিভিন্ন দিকে বাঁক নিল। কে বলবে জীবনে প্রথম দিন আমরা দু'জনদু 'জনের সামনে বসে আছি।

মনে আছে, অনেক কথার ভিড়ে ওকে জিগ্যেস করেছিলাম, সম্পর্ক মানে কি?

ও বলেছিল, একজনের আয়নায় অন্যজনকে খুঁজে পাওয়ার মধ্যেই একটা সুতোর মূল তাৎপর্য।

ওর কথা শুনতে শুনতে ভারি আশ্চর্য হয়ে উঠছিলাম। আজকের এই মলমাল্টিপেক্সের ঝাঁচকচ কে জগতে মানুষ এখনও জীবন নিয়ে এত ভাবে! কলির দার্শনিকতা আমাকে মুগ্ধ করেছিল।

খুব বেশি সময় আমরা থাকিনি। ও স্যান্ডউইচ অর্ডার দিয়েছিল। বিল আসতেই দেখি ফস করে নিজের মানিব্যাগ খুলছে। আমি বললাম, একদম নয়। আমি দেব টাকা।

ও কিছুতেই মানল না। চোখ পাকিয়ে বলে, আমার শহরে তুই এসেছিস। আজ আমি তোকে খাওয়াব।

ওর কথায় দারুণ রাগ হল, তোর শহর মানে? কলকাতা আমারও শহর!

কলি খুনসুটি হেসে বলল, না তুই এখন দিলিস্নবাসী।

হঠাৎ ওর মোবাইলটা বেজে উঠল, হ্যালো... হ্যাঁ... আমি আসছি... না না ক্লাস হয়ে গেছে... তুই একটু বোস... আমি আসছি। মোবাইলটা রেখে মুখ কাঁচুমাচু করে বলল, সরি রে, অভ্র এসেছে বাড়িতে। ওয়েট করছে। আমাকে এখন যেতে হবে।

আমি বললাম, নো প্রোবলেম। আমাকেও উঠতে হবে। কিছু কেনাকাটা আছে। তারপর বাড়ি ফিরব।

আসার সময় বইয়ের স্টল থেকে কলির জন্য একটা কবিতার বই নিয়ে এসেছিলাম, শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের অনুবাদ করা পাবলো নেরুদার শ্রেষ্ঠ কবিতা। ওর দিকে এগিয়ে দিতেই, কলি আমাকে পুনরায় বিস্মিত করে আমার উপহার ফিরিয়ে দিল। বলল, এটা আমি নিতে পারব না রে। আমি তোর জন্য যা করেছি তা তো বন্ধুর কর্তব্য। এটা নিলে আমি অনেক ছোট হয়ে যাব। আর এই বইটা অলরেডি আমার আছে। এক কাজ কর, তুই এটা নিয়ে যা, বাড়িতে গিয়ে পড়িস।

জীবনে প্রথম কেউ আমার দেওয়া উপহার ফিরিয়ে দিল। বেশ আহতই হয়েছিলাম। আবার এটাও অনুভব করেছিলাম, এই কারণেই কলি হয়তো আর দশজনের থেকে আলাদা। ওর মধ্যে আশ্চর্য এক চারিত্রিক দৃঢ়তা আবিষ্কার করেছিলাম, ঠিক যেমন খুঁজে পাই আমার নিজের শহরে। বলাই বাহুল্য, এর পরে কলিকে আর কখনও কোন উপহারের কথা বলিনি।

ট্যাক্সি করে ফেরার পথে আসা রুদ্ধশ্বাস পনেরো মিনিট রিওয়াইন্ড করছিলাম। জানলার পাশ দিয়ে এক এক করে পিছলে যাচ্ছিল ধর্মতলা, ময়দানের ঘাস, ভিক্টোরিয়া... নিজের খেয়ালেই ওর ফিরিয়ে দেওয়া কবিতার বইটা উল্টোলাম। প্রথম পাতায় অনেক ভেবে ওর জন্য লিখেছিলাম কিছু লাইন। ওগুলোর প্রয়োজন ফুরিয়ে গিয়েছে। পাতাটা ছিঁড়ে উড়িয়ে দিলাম জানলার বাইরে। জানি না আবার কবে দেখা হবে কলির সঙ্গে। আদৌ আর হবে তো?

তিন.

দৈনন্দিন কাজের স্রোতে আমরা দু'জনে যেন নিজেদের থেকে সরতে সরতে ক্রমশ পৃথিবীর দুই গোলার্ধে হারিয়ে যাচ্ছিলাম। কলি আর আগের মত ইয়াহুতে নিয়মিত নয়। ওর কেরিয়ারে খড়বাঁ শের নিষ্প্রাণ মেরুদণ্ডে মৃত্তিকার প্রলেপরচনে নিদারুন মগ্ন। গবেষণার পাহাড়প্রমাণ কাজের চাপে আমিও হয়ে পড়েছিলাম দিশেহারা। অবশ্য তাই বলে একবারও যে আমাদের মধ্যে কথা হয়নি তা নয়। মাঝে একবার কি দু'বার মোবাইলে যোগাযোগ হয়েছিল, তবে সে সংক্ষিপ্ত ঝটিকা-কথোপকথন বারান্দার এক কোণায় পরিত্যক্ত মানিপ্ল্যান্টের গোড়ায় ছ'সাত মাসে একবার নামকাওয়াস্তে যত্নসহকারে জল ঢালার মতই যান্ত্রিক। এমন আলাপচারিতায় একবার জেনেছিলাম ও কল্যাণীতে এম ফিল করছে। তারপর একদিন শুনলাম কলকাতার একটি কলেজে অল্প বেতনে চাকরিতে জয়েন করেছে। ব্যাস এইটুকুই। ক্যালেন্ডারের পাতা নিজের হিসেবমত উড়তে লাগল। চারপাশের পৃথিবীতে অনেক নতুন নতুন ইতিহাস তৈরি হল। সাদ্দামের ফাঁসি, ওবামার গর্জন, সরোজিনী নগরকনট পেসমু স্বইয়ে একের পর এক বিস্ফোরণ, নন্দীগ্রাম, সিংগুর... নিউজপ্রিন্ট ও বোকাবাক্সে অনর্গল আসাযাওয়া... আমরা

দুই বন্ধু দেশের দুই প্রান্তে মজে রইলাম নিজেদের সুন্দর ভবিষ্যতের স্বপ্নে। তিনটে বছর কেমন রুদ্ধশ্বাসে কেটে গেল, ঠাওরই করতে পারলাম না।

থিসিসের কাজ শেষ করে পুজোর সময় নিজের শহরে ফিরলাম। চার বছর পর পুজোয় ফের কলকাতায়। অদ্ভুত এক আনন্দ যেন আমায় আপদমস্তক ঘিরে ছিল। দিলিতেও বেশ কিছু পকেটে যেমন সিআর পার্ক, কালি বাড়ি, পশ্চিম বিহার, আইএসবিটি অঞ্চলে ভাল পুজো হয়। কিন্তু কলকাতার মজাই আলাদা। ঢাকের তালে শহরের জরাজীর্ণ ট্রামলাইন, ঘাস-কাদাধু লোহাত টানা রি ক্সাবাস গুলো যেন নতুন প্রাণ পায়, অদ্ভুত জীবন্ত হয়ে ওঠে। নিজের ঘরে খাটে শুয়ে একমনে মোবাইলে নেমলি স্টে স্ক্রল ডাউন করতে করতে হঠাৎ নজর পড়ল 'কলি'। আপন খেয়ালে পাঠিয়ে দিলাম ছোট্ট এসএমএস... 'শহরে, ছুটিতে'।

উত্তর এল কয়েক মিনিট পর ওয়াও, কত দিনের ছুটি?

– এক মাস। তোর কি খবর? বিয়ে করেছিস?

– হ্যাঁ, এখন হানিমুনে এসেছি। (সঙ্গে একটা স্মাইলি)

এসএমএসটায় একমুহূর্ত থমকে গেলাম। কলির বিয়ে হয়ে গেল, একবার জানতেও পারলাম না! কেন জানি হঠাৎ কিছু খারাপ লাগা আগাছার মত ভিড় করল চারধারে। কিছু বললাম না। চুপ করে মোবাইলটা পাশে রেখে দিলাম। খানিক পর মোবাইলটা নড়ে উঠল: কি রে চুপ হয়ে গেলি?

না... কনগ্র্যাটস...

জিগ্যেস করলি না আমার হাজবেন্ডটি কেমন?

নিশ্চয় ভালই হবে। ভাল থাকিস।

হ্যাঁ রে দারুন ভাল... হেব্বি হ্যান্ডসাম। তুই চিনিস।

আমি চিনি? নিজের মনে ভাবার চেষ্টা করলাম। আকাশপাতাল... উঁহু কোন মুখই মনে পড়ল না। অভ্রকে কোনদিন দেখেছি বলে তো মনে পড়ে না। তবু ঢিল ছুঁড়লাম আন্দাজে: অভ্র...

নো... ঋত্বিক (সঙ্গে আবার একটা স্মাইলি)

ঋত্বিক? এ নাম তো শুনিনি আগে! কি জানি, সম্পর্কগুলি অনেকটা পাথরকুচির মত। কখন কোথা দিয়ে যে গজিয়ে ওঠে বিধাতা-পুরুষই সে খবর রাখেন।

ও বোধহয় আমার ইতস্ততভাব টের পেয়েছিল। কিছু পরেই আর একটা এসএমএস: কি রে তুই ঋত্বিক রোশনকে চিনিস না? বুদ্ধু কোথাকার!

ফোন করলাম: মস্করা হচ্ছে?

কলি হাসল, সত্যি তুই এখনও সেই আগের মতই বোকা রইলি! বিয়ে করলে জানতে পারতি না?

– চারপাশে সকলেই তো বুদ্ধিমান। আমি না হয় বোকাই থাকলাম।

– খালি বাজে কথা। চল না একদিন দ্যাখা করি। চুটিয়ে আড্ডা দেওয়া যাবে।

– কবে?

– তুইই বল?

– পঞ্চমী... সকালবেলা।

– সকাল হবে না। কলেজে জরুরি কিছু কাজ আছে। একটু পরে, আই মিন সাড়ে এগারোটা নাগাদ হতে পারে।

– ওকে, দেন সাড়ে এগারোটায় এক্সাইডের মোড়ে হলদিরামের সামনে ওয়েট করিস।

ফোন রেখে দিলাম। মনের ভিতর অদ্ভুত এক আনন্দ হল। কতদিন পর আবার কলির সঙ্গে দ্যাখা হবে!

চার.

তিন বছরে একটু মোটাসোটা হয়েছে। কাজের চাপ স্পষ্ট চোখেমু খে। পরিবর্তনের আর কোন চিহ্ন নেই। খবরের কাগজ-বোকাবাক্সের বকবকানিতে শহরে যতই রাজনৈতিক বদল আসুক, কলকাতা আছে কলকাতাতেই।

ভিড়ে ঠাসা হলদিরামে সিঁড়ি দিয়ে উঠে এক কোণায় দু'জনে বসলাম মুখোমুখি। এতদিন পর কি বলব, কি বলব না ভাবতে ভাবতেই কিছুটা সময় হুড়মুড় পালিয়ে গেল। এরপর কিছু রুটিনমাফিক প্রশ্ন, যেমন বিয়েবাড়িতে রাধাবলভি-ছোলার ডালের সঙ্গে ছোট ল্যাজ বেগুনী কিংবা ঝুরো আলুভাজা পরিচিত দৃশ্য... প্রথমে কেমন আছিস, তারপর ধীরে ধীরে তোর থিসিসের কাজ কেমন হল, কবে ডিগ্রি পাবি, এরপর কি করবি, দিলিতে এখন কেমন টেম্পারেচার, শেষে তুই বড্ড রোগা হয়ে গেছিস!

এর ফাঁকেই এসে গেল দু'গ্লাস রঙিন সরবৎ। বরফ-ডোবা শীতল পানীয় স্ট্র বেয়ে মুখের ভিতর পথ ভুলে জিহ্বার ত্বকে ছড়িয়ে দিল কিছু মিষ্টি নেশা। কলিতে জিগ্যেস করলাম, অভ্রর খবর কি? প্রেমলীলা কেমন চলছে?

ওর মুখে কেমন এক ক্লান্তি ফুটে উঠল, আর প্রেম... সম্পর্কগুলো আজকাল মাঝে মাঝে কেমন যেন কাচের দেয়াল মনে হয়। দেখতে পাই, কিন্তু ছুঁতে পাই না। এরপর একটু নীরবতা। ওর চোখ দুটোয় খেয়াল করলাম, কেমন যেন হারিয়ে গিয়েছে, অভ্র অনেক বদলে গিয়েছে। আগে লিটারেচার নিয়ে কত কথা বলত, কত নির্ভেজাল আড্ডা হত আমাদের। এখন সময়ের বড় অভাব। যেটুকু কথা হয় প্রায় পুরোটাই জুড়ে থাকে হয় টাকা, নয়তো টিউশন; না হলে কিভাবে ওপরে ওঠা যায়।... জানিস, সাহিত্য ওর জীবন, কিন্তু জীবন কখনও সাহিত্য হতে পারেনি। মাঝে মাঝে ওকে ভারি অচেনা লাগে।

ওর কথায় একটা চাপা মেটে কষ্ট টের পেলাম।

ভরসা যোগাতে বললাম, এরকম ভাবছিস কেন? সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সব কিছুই তো বদলায়। সাহিত্যের সঙ্গে বাঁচতে গেলে হয়তো এগুলিরও প্রয়োজন আছে।

– আমি ঠিক মানি না। ভাল থাকার সংজ্ঞা আমার কাছে ডিফারেন্ট জ্যোতির্ময়। অর্থের প্রয়োজনীয়তা আমি বুঝি, কিন্তু তা যেন কখনই মূল ভালবাসাকে অন্ধ করে না দেয়।

এর উত্তরে আমার কিছু বলার ছিল না। সত্যি কথা বলতে এই প্রসঙ্গে ওর সঙ্গে তর্কে যেতে ইচ্ছে করছিল না। কারণ বুঝতে পারছিলাম, যাই বলব সেটা বড় মেকি বা পাস্টিক ঠেকবে। মনে মনে ওর জীবনবোধ আর আমার দর্শন যে মিলে গিয়েছে। দ্বন্দ্বে যাব কী উপায়ে?

প্রসঙ্গ বদলাতে জিগ্যেস করলাম, সুচেতনা, সুনির্মল, অরুণ... ওরা কেমন আছে?

আমি যে নদীর গতিপথ পরিবর্তনের চেষ্টা করছি কলি বুঝতে পেরেছিল। মৃদু হেসে বলল, সবাই ভাল আছে। যে যার নিজের কাজে ব্যস্ত। মাঝে মাঝে জিটক, অর্কুটে কথা হয়। সুচেতনা কলকাতাতে আছে। ওর সঙ্গে মাঝে মাঝে ফোনে যোগাযোগ হয়। গত সপ্তাহে দ্যাখা হয়েছিল এস্পলানেডে, শ্রীলেদার্সের সামনে।

এতদিন পর দু'জনে কথা বলছি। টের পাচ্ছিলাম দু'জনের ভিতরেই একটা চাপা উত্তেজনা রয়েছে। কিন্তু তার সঙ্গে এও বেশ

সামনের সিটে এক বাইশ-তেইশ তন্বী সমবয়সী এক যুবকের সঙ্গে হাসির ফেয়ারায় ভিজে। মেয়েটির পোশাকে দেখলে স্বয়ং প্রজাতি ব্রহ্মার ধ্যান ভঙ্গ হবে। উদ্ধত কুচযুগল ফিনফিনে টি-সার্টের বাঁধন মুক্ত হতে আকুলি বিকুলি করে। তার উপর নির্লজ্জ এডভার্টাইজমেন্ট: ইফ ইউ ক্যান, ক্যাচ মি। ছেলেটি হাবে-ভাবে একেবারে জন এব্রাহাম, থুতনির কাছে কিছু কালচে দাড়ি।

কলেজ স্ট্রিটে কিছু বই কেনার ছিল। কলিরও ওর কোন বন্ধুর জন্মদিনের গিফ্‌ট কিনতে হবে। তাই বেশিক্ষণ আর থাকলাম না। হলদিরাম থেকে বেরিয়ে রবীন্দ্রসদন স্টেশন থেকে মেট্রো ধরলাম। দিলির ঝাঁ-চকচকে মেট্রোয় চড়ার পর কলকাতার পাতাল রেলে উঠলে মনে হয় রাজধানী এক্সপ্রেস থেকে নেমে ট্রামে বসেছি। মাথার উপর কোন আদিম কাল থেকে ঝুলমাখা জালের ফাঁকে ক্লান্তিহীন ছ্যাড়ছ্যাড় ঘুরে চলেছে চ্যাপ্টা পাখা।

বুঝতে পারছিলাম, আমাদের মাঝে কথাগুলোর মধ্যে যেন বেহালার কিছু আলতো সিম্ফনি লুকিয়ে আছে।

কথার টানে কলি কোথাও হারিয়ে গিয়েছিল। শূন্য দৃষ্টিতে নিজের মনে বলল, জানিস বাইরের ঘরে অনেক বন্ধু, কিন্তু ভিতর ঘরে গুটিকতক।

ওর কথাগুলো আমার মনের নোনাবালিতে রেখে যায় কিছু অব্যক্ত নীল দ্রাঘিমা।

কলেজ স্ট্রিটে কিছু বই কেনার ছিল। কলিরও ওর কোন বন্ধুর জন্মদিনের গিফ্‌ট কিনতে হবে। তাই বেশিক্ষণ আর থাকলাম না। হলদিরাম থেকে বেরিয়ে রবীন্দ্রসদন স্টেশন থেকে মেট্রো ধরলাম। দিলির ঝাঁচকচ কে মেট্রোয় চড়ার পর কলকাতার পাতাল রেলে উঠলে মনে হয় রাজধানী এক্সপ্রেস থেকে নেমে ট্রামে বসেছি। মাথার উপর কোন আদিম কাল থেকে ঝুলমাখা জালের ফাঁকে ক্লান্তিহীন ছ্যাড়ছ্যাড় ঘুরে চলেছে চ্যাপ্টা পাখা। চারধারে ভাল করে তাকালে বেশ বোঝা যায় সপ্তাহে সত্যি সত্যি ক'টা দিন কামরাগুলি পরিষ্কার হয়! তবু ওই যে বলে ঐতিহ্য, বাঙালির সব ব্যাপারে রোমান্টিক নস্ট্যালজিক দাওয়াই, দেশের প্রথম পাতাল রেল, সেই ঢেকুর তুলেই নিজেকে ফাঁপা সান্ত্বনা দিয়ে দুই বন্ধু মিশে গেলাম শহুরে যাত্রীর ভিড়ে।

দিলি, মুম্বই থেকে কলকাতা কোন অংশে পিছিয়ে নেই। ইয়ু গে যান্ত্রিক আধুনিকতা সব মেট্রোপলিটনকে এক অক্ষরেখায় এনে দাঁড় করিয়েছে। কমিউনিস্টরা যতই ক্যালকাটাকে 'কোলকাতা' বানাক, নতুন প্রজন্মের উগ্র পাশ্চাত্য প্রীতি ও বিলাতি ভাষার কলকলানিতে আদি অকৃত্রিম মোচার ঘন্টের পরিবর্তে বাঙালি পাচক ফাটকাবাজি পাঁচমিশেলী ছেঁচকিতে বেশি আনন্দ পায়। ভিড়ের মধ্যে আমরা কোনমতে গা-ঘেঁষে দাঁড়িয়েছিলাম। সামনের সিটে এক বাইশ-তেইশ তন্বী সমবয়সী এক যুবকের সঙ্গে হাসির ফেয়ারায় ভিজে। মেয়েটির পোশাকে দেখলে স্বয়ং প্রজাপতি ব্রহ্মার ধ্যান ভঙ্গ হবে। উদ্ধত কুচযুগল ফিনফিনে টিসা র্টের বাঁধন মুক্ত হতে আকুলি বিকুলি করে। তার উপর নির্লজ্জ এডভার্টাইজমেন্ট: ইফ ইউ ক্যান, ক্যাচ মি। ছেলেটি হাবেভা বে একেবারে জন এব্রাহাম, থুতনির কাছে কিছু কালচে দাড়ি। গোটা কামরাটা মোটামুটি একটা মিনি মুড়ির বাক্স। তার মধ্যেই ইয়াং বেঙ্গল হাহাহিহি 'আমিতুমি, তুমিআমি', অভিষেকঐশ্বর্য, মোবাইলে শরীরী ছবি, টুকরো টুকরো নীল এসএমএসে মজে। মধ্য থেকে পক্ককেশের ভিড়ে সিপিএমতৃণমূল তোলপাড়, কেউ আবার বিচ্ছিন্ন পারিবারিক, বৈষয়িক ও বাণিজ্যিক আলোচনায় মগ্ন। সব মিলিয়ে মেট্রোর কামরা এক জগাখিচুড়ি অর্কেস্ট্রার প্যাকেজ।

সামনের মেয়েটির দিকে নির্লজ্জ তাকিয়ে আছি দেখে কলি হাতে চিমটি কেটে গলা নামিয়ে বলল, কি রে ওরকম প্যাটপ্যাট করে তাকিয়ে কি দেখছিস?

নব্য কলকাতাকে। কলোনিনী শাড়িসা লোয়ার ছেড়ে খোলা বুকে তিলোত্তমা হতে চায়!

ও হেসে ফেলল, অসভ্য কোথাকার!

সেন্ট্রাল এভিন্যুয়ে নেমে পাবলিক হেলথ এন্ড হাইজিনের পাশের গলিতে ঢুকতে কে যেন ফিসফিস করে আমার কানের কাছে জিগ্যেস করল, এত বছর কোথায় ছিলি জ্যোতি?

নিজের ভিতর চমকে উঠলাম।

কি রে, কি হল?

না... কিছু না... এই পাড়ায় এলে শহরটা মনে হয় কেমন জ্যান্ত হয়ে উঠেছে!

যা বলেছিস! আমার তো একেক সময় মনে হয় শহরটার হৃৎপিণ্ড কেউ এখানে পুঁতে দিয়েছে।

আইআইএসডবিউবিএমএর সাম নে দিয়ে যেতে এক মুহূর্ত থমকে দাঁড়ালাম। মলিকা এখানে পড়ত। এক সময় ওর সঙ্গে দ্যাখা করতে এদিকে অনেক এসেছি। আমাদের অনেক হাসিকান্নারাগঅভিমা নের সাক্ষি এই বিল্ডিং, সামনের অজর অক্ষয় কালো পিচ, রাস্তার ধারে স্ট্রিট ল্যাম্প।

কি রে, কি দেখছিস?

কিছু না... জাস্ট কিছু ফ্ল্যাশব্যাক...

কলি এগিয়ে এল কাছে। আলতো জিজ্ঞাসা, মলিকার সঙ্গে এর মধ্যে কোন কনট্যাক্ট হয়েছে?

মাথা নাড়লাম ধীরে... ও হারিয়ে গিয়েছে... সি ইস লস্ট...

শেষ তিনটি শব্দ যেন নিজেকেই বেশি বোঝাতে চাইলাম। কিন্তু মন ভারি অবুঝ। একটা ক্লাস টু'র বাচ্চার মত চোখের পাতা দুটো আমার অজান্তেই তির তির কেঁপে উঠল। অন্যদিকে তাকালাম, চল...

কাঁধে টের পেলাম কলির নরম আঙুল।

কলেজ স্ট্রিট পাড়াটা যেন ঈশ্বরের ল্যাবরেটরি। কয়েক পা হাঁটলেই মেলে এক এক আবিষ্কার। পুরনো বইয়ের হলদে গন্ধ, পুঁটিরামপ্যারামাউন্ট কিংবা কলেজ স্কোয়ারের জলের ভাঁজগুলো যেন চুম্বকের মত টানে। আমার ক্ষ্যাপামো দেখে কলি ধরে রাখতে পারে না ওর হাসি। বলে, তোর বয়স দিন দিন বাড়ছে না কমছে?

আমি বলি, উদো হয়ে গিয়েছি। এই পাড়ায় এলে আমার বয়স কমতে থাকে।

বায়ো না ত্যায়ো?

কম আরও কম, আরও আরও...!

আমাদের হাসিতে কলেজ স্ট্রিটের হাড়প্যাঁজর ভিজ তে থাকে।

পুরনো কলকাতার ভিড়ে একসঙ্গে চলতে চলতে এক সময় অবচেতনে দু'জনেই উপলব্ধি করি, জীবনের ছায়াপথে পরস্পর যত দূরেই বাস করি না কেন, যে অদৃশ্য নামহীন গ্রন্থিতে দু'জনে বাঁধা পড়েছি, তার জোর রোজকার নামজানা অ নেক সম্পর্কের থেকেই অধিক নিবিড়, ঘন ও আন্তরিক। মন তবু অবাধ্য। নিজের খেয়ালে প্রতিনিয়ত হাতড়ে খোঁজে পথের নাম।

পাঁচ.

আমরা ফুটপাথ ধরে হাঁটছিলাম। কথায় কথায় ওকে জিগ্যেস করলাম, কলেজে ক্লাসে ছেলেমেয়েরা তোকে বিরক্ত করে না?

ও বলল, না। বরং ঠিক উলটো। ওরা আমায় খুব ভালবাসে। আমার কী মনে হয় জানিস, ওরা বোধহয় আসলে

ইচ্ছে ছিল, ফেরার আগে কলির সঙ্গে একবার দেখা করে আসি। জানি না, আবার কবে দেখা হবে! (আদৌ হবে তো?) এরপর ও সিঁথি রাঙিয়ে কোমর বেঁধে সংসারী হয়ে উঠবে, আমিও মিশে যাব কাজের ক্ষ্যাপা স্রোতে। আমাদের বাইরের পথ যে আলাদা! কিন্তু মোবাইলে আবদারের আগে ভাবলাম, ও নিজে থেকে যেচে যে আড়াই ঘণ্টা দিল, তার অকৃত্রিমতা বুঝি এই তাৎক্ষণিক চাহিদার চোরাবালিতে হারিয়ে যাবে।

বাইরের পৃথিবীটার সঙ্গে ঠিক যোগসূত্র খুঁজে পায় না। আমি ওদের সেই সেতুর সন্ধান দিই।

আমি কলির দিকে তাকালাম। ও তখন নস্ট্যালজিক। হারিয়ে গিয়েছে পুরনো দিনে। 'প্রথম যেদিন কলেজে গেলাম, হেডস্যার আমাকে ক্লাসে সকলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। আমার তখন সেদিকে মন নেই। হারিয়ে গেছি ওই ব্ল্যাক বোর্ড, টেবিল, চেয়ার, বেঞ্চগুলোয়। জানিস, আগে কতদিন ভয়ে ভয়ে ডায়াসে উঠতাম, স্যারের টেবিলটা ছুঁতে আঙুল কাঁপত। সেদিন প্রথম ডায়াসে উঠে মনে হল, কলেজ লাইফের ক্ষ্যাপা স্বপ্নগুলো আজ যেন ডানা মেলে প্রজাপতি হয়ে উঠেছে!'

ওর চোখেমু খে অদ্ভুত এক তৃপ্তি লক্ষ্য করলাম। স্বপ্নকে কাছে পাবার আনন্দ।

কিন্তু কলেজের পলিটিক্স...

একদম ভাল লাগে না। আমি আগে যে কলেজে ছিলাম ওখানে ভীষণ ছিল। কলেজ লাইফটা বাঁচিয়ে রাখতে ছ'মাসের মধ্যে চাকরিতে রেজিগনেশন দিলাম। দেখলাম ক্লাস রুমটাই ভাল, স্টাফ রুমটা বড্ড সাফোকেটিং! যাদের এতকাল শ্রদ্ধার চোখে দেখে এসেছি, তাদের মনে হল বড় বেশি করে 'মানুষ'।

আমরা হাঁটতে হাঁটতে বড় রাস্তায় এসে পড়েছিলাম। একটা ট্রাম কালো পিচ চিরে ধুঁকতে ধুঁকতে বেরিয়ে গেল। পিছনে এক দঙ্গল বাস, ট্যাক্সি ক্রমাগত হর্ণ বাজাচ্ছে... এখানে কলকাতা জবরজং!

যান্ত্রিক মিছিলের দিকে তাকিয়ে নিজের মনেই বললাম, যেদিকেই তাকাবি, শুধুই 'মানুষে'র ভিড়। সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম স্বার্থে সকলেই দ্বন্দ্বে মেতে। অদ্ভুত এক সময়ের মধ্যে আমরা এগিয়ে চলেছি। চারপাশে শুধুই গুমোট।

যা বলেছিস। মাঝে মাঝে মনে হয়, একটা ভেন্টিলেসনের খুব প্রয়োজন। যে পথে এক চিলতে রোদ আসবে, একটু আলো, একটু বৃষ্টি।

আমরা সবাই সেই পথের দিকেই তাকিয়ে থাকি কলি। তুই যাদের একটু আগে 'মানুষ' বলে বেশি জোর দিলি, তারাও থাকে। আমরা শুধু বুঝতে পারি না। প্রত্যেকে নিজের মত করে দহনে পোড়ে। আর পুড়তে পুড়তে নিজের মত করে বৃষ্টির লোভে দিন গোনে। সেই দহনের যন্ত্রণা কেবল সেই বোঝে, আর কেউ নয়। সব যন্ত্রণার নাম থাকে না কলি।

ও এক দৃষ্টে তাকিয়ে থাকে আমার দিকে। ওই দৃষ্টিতে গভীরতা আছে, টের পাই।

একটা গিফ্টশপে ঢোকার মুখে একটা বাচ্চা ছেলে ওর সালোয়ারটা পিছন থেকে খামচে ধরল। ছেলেটার বয়স বড় জোর আটনয় হ বে। আদুড় গা, পরনে কেবল একটা হাফ প্যান্ট। শারদীয় মরসুমে ও ওর মত উৎসবে মেতে। কলি ইতস্ততভাবে মানিব্যাগ থেকে কিছু খুচরো দিয়ে ওর খপ্পর থেকে বেরিয়ে এল।

আমি হাসতে হাসতে বললাম, ওর যন্ত্রণার নাম কি জানিস?

কলি তাকিয়ে থাকল নিরুত্তর।

আমি বললাম, কলকাতা!

গিফ্টশপ থেকে কিছু কেতাবি উপহার কিনে দু'জনে আর বেশিক্ষণ থাকলাম না। ও একটা বাস ধরে হারিয়ে গেল। আমি পাতিরাম থেকে কয়েকটা লিটল ম্যাগ ব্যাগে পুরে ট্যাক্সি ধরলাম। মৌলালির মুখে মোবাইলটা নড়ে উঠল... এসএমএস, 'বাড়ি এসে গেছি। বেশ কাটল দিনটা। অনেক দিন পর তোর সাথে দেখা হয়ে বেশ লাগল কিন্তু!'

ছয়.

ছুটির মেয়াদ ধীরে ধীরে ফুরিয়ে এল। প্রায় একটা মাস শারদীয় কলকাতায় দিব্য কাটল! ইচ্ছে ছিল, ফেরার আগে কলির সঙ্গে একবার দেখা করে আসি। জানি না, আবার কবে দেখা হবে! (আদৌ হবে তো?) এরপর ও সিঁথি রাঙিয়ে কোমর বেঁধে সংসারী হয়ে উঠবে, আমিও মিশে যাব কাজের ক্ষ্যাপা স্রোতে। আমাদের বাইরের পথ যে আলাদা! কিন্তু মোবাইলে আবদারের আগে ভাবলাম, ও নিজে থেকে যেচে যে আড়াই ঘণ্টা দিল, তার অকৃত্রিমতা বুঝি এই তাৎক্ষণিক চাহিদার চোরাবালিতে হারিয়ে যাবে। তার চেয়ে ওর এই উপহার মনের শীতলঘরে পেঁয়াজকলি হয়ে বেঁচে থাক। কাঙাল আমি ভিতরে, বাইরের পৃথিবীকে জানিয়ে কি লাভ?

রজনীগন্ধা শুকিয়ে যায়। বেঁচে থাকে ওর গন্ধ।

কলকাতা আমার রজনীগন্ধা। পৃথিবীর যে প্রান্তেই যাই না কেন, আমার চারপাশে ওর গন্ধ জড়িয়ে থাকবে মাধবীলতার মত।

ফ্লাইটে উঠি, ফর্সা আকাশের দিকে তাকাই। কলকাতা সবে ঘুম থেকে উঠেছে। এক সময় উড়ান ছাড়ে। জমি থেকে দূরত্ব ক্রমশ গাঢ় হয়। জানলার কাচ দিয়ে দেখি, আমার প্রকা-শহরটা ধীরে ধীরে ছোট হতে হতে একটা সময় হাতের তালুর সমান চেকার-বোর্ডে পরিণত হয়ে ক্রমশ ঝাপসা হয়ে গেল। এর পর শুধুই আকাশ। সকালের ঘন দুগ্ধফেনিল মেঘগুলো জাপটে ধরল ইন্ডিগোর লৌহশরীর, এঁকে দিল গত রাতের নরম বাসি চুম্বন। ওদের ভিড়ে মিশে যেতে যেতে আমিও ক্রমশ তলিয়ে যেতে লাগলাম এক গভীর কুয়াশায়... নিজেদের অজান্তে কোন গ্রন্থিতে জড়িয়ে পড়লাম দু'জন? মনের অভিধান তন্ন তন্ন করে খুঁজলাম, কিন্তু পেলাম না সঠিক নাম। এক সময় মনে হল, এসব পার্থিব নামকরণের ভিতর ঢোকাই মূর্খতা। সংসারে এমন অনেক সূত্র ঈশ্বর রচনা করেন, যা আর দশটা পরিচিত দৈনন্দিন সম্পর্কের ভিড়ে হারিয়ে যাবার নয়, সংঘাতেও আসার নয়। আমাদের গল্পটাও এমনই এক দৈব-উপহার।

ঘরে ফিরে এসএমএস করলাম: 'ভালবাসা', 'বন্ধুতা' শব্দগুলো অনেক ব্যবহারে ক্লিশে, বড় ম্যাড়ম্যাড়ে ঠেকে। বরং তুই আমার জীবনে এক আশীর্বাদ... অনেক ভেবে পথ, তাই তোর নাম রাখলাম 'আশীর্বাণী'।

বেশ কিছুক্ষণ পরে ওদিক থেকে উত্তর পেলাম। কোন কথা নেই। কেবল একটা স্মাইলি... একটা গোল মুখ হাসছে!

অনুভব করলাম, মন যখন শব্দ খুঁজে পায় না, তখন আলতামিরা অর্ধেক আকাশ।

কৌস্তভ বসু
ভারতের গল্পকার

নিজেদের অজান্তে কোন গ্রন্থিতে জড়িয়ে পড়লাম দু'জন? মনের অভিধান তন্ন তন্ন করে খুঁজলাম, কিন্তু পেলাম না সঠিক নাম। এক সময় মনে হল, এসব পার্থিব নামকরণের ভিতর ঢোকাই মূর্খতা। সংসারে এমন অনেক সূত্র ঈশ্বর রচনা করেন, যা আর দশটা পরিচিত দৈনন্দিন সম্পর্কের ভিড়ে হারিয়ে যাবার নয়, সংঘাতেও আসার নয়। আমাদের গল্পটাও এমনই এক দৈব-উপহার।

ফিরে দেখা

ওড়িশী নৃত্য

ড. মঞ্জুলিকা রায়চৌধুরী

অধুনা ওড়িশী নৃত্য নৃত্যমহলে নিজের আসনটি বেশ সুপ্রতিষ্ঠিত করে নিয়েছে, এমনকি ওড়িশী নৃত্য শাস্ত্রীয় নৃত্যের অন্তর্ভুক্ত হতে চলেছে। ওড়িশী নৃত্যগুরুরা ওড়িশী নৃত্যকে একটি প্রাচীন নৃত্যকলা বলে মনে করেন। তবে এ কথা অস্বীকার করা যায় না যে, ওড়িশাতে অতি প্রাচীনকালেও নৃত্যগীতের চর্চা ব্যাপকভাবে ছিল। এর যথেষ্ট প্রমাণ এখনও পর্যন্ত পাওয়া যায়।

ওড়িশী নৃত্যের প্রাচীনত্ব বিচার করতে গিয়ে ওড়িশীর নৃত্যগুরুরা *নাট্যশাস্ত্রের* উলেখ করে তার বিচারবি বেচনা করেছেন। এঁদের মতে ভরতের *নাট্যশাস্ত্রে* যে চার রকম পদ্ধতির উলেখ আছে তার একটি পদ্ধতি ওড়িশী নৃত্যে বিদ্যমান। এই চারটি পদ্ধতি হল– অবন্তী, দাক্ষিণাত্য, পাঞ্চালী ও ওড্র মাগধী। ওড্র মাগধী পদ্ধতি ওড্র, কলিঙ্গ, বঙ্গ, নেপাল এবং ভারতের পূর্বপ্রান্তে অবস্থিত অন্যান্য দেশেও প্রচলিত ছিল। *নাট্যশাস্ত্রের* শত শত বছর পরে লেখা *অভিনয়চন্দ্রিকাতে* সাত রকম পদ্ধতির উলেখ আছে। পদ্ধতিগুলি হচ্ছে– মাগধী, সৌরসেনী, কর্নাট, কেরালা, গৌড়, পঞ্চানন্দ ও ওড্র। ভারতবর্ষ জুড়ে যে সঙ্গীতের প্রসার বৃদ্ধি পেয়েছিল তা এই নামের সংখ্যা থেকেই বোঝা যায়। তিনটি পদ্ধতির প্রয়োগ বর্তমানে দেখা যায়। যেমন– কর্নাট পদ্ধতিতে ভরতনাট্যম, কেরালা পদ্ধতিতে কথাকলি এবং ওড্র পদ্ধতিতে ওড়িশী নৃত্য। *অভিনয়চন্দ্রিকায়* উপরোক্ত পদ্ধতিগুলির বিস্তারিত বিবরণ ও তাদের বিশেষত্বের উলেখ করা হয়েছে। যেমন– মাগধী পদ্ধতিতে ভাবের ওপর, সৌরসেনীতে আঙ্গিক ক্রিয়ার ওপর, কর্নাটে সকল বিষয়ের ওপর এবং কেরালাতে আনুষ্ঠানিক ক্রিয়ার ওপর বিশেষ প্রাধান্য দেওয়া হত। গৌড় দ্বৈতনৃত্যের জন্য বিখ্যাত ছিল। পঞ্চানন্দে শুদ্ধ নৃত্যপদ্ধতি অবলম্বন করা হত। ওড্র ও মাগধীতে ভাবের প্রাধান্য ছিল। সেই জন্যে বোধহয় আচার্য ভরত ওড্রমাগধীর একস ঙ্গে উলেখ করেছেন।

সাধারণত দেখা যায় যে, ওড়িশী নৃত্যে শাস্ত্রীয় ব্যাকরণ অপেক্ষা সৌন্দর্য সৃষ্টি ও তাকে সুষমামণ্ডিত করার দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয়। ওড়িশী নৃত্য *নাট্যশাস্ত্র* ও *অভিনয় দর্পণ*কে বিশেষভাবে অনুসরণ না করে ওড়িশায় প্রাপ্ত সঙ্গীত গ্রন্থ *অভিনয়চন্দ্রিকা*কেই বিশেষভাবে অনুসরণ করে। সৌন্দর্য সৃষ্টির ওপর এই নৃত্যশৈলীর বিশেষ লক্ষ্য থাকায় শাস্ত্রের নির্দেশিত ব্যাকরণ কখনও কখনও ক্ষুণ্ন হলেও তাতে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয় না। তবে আধুনিক ওড়িশী নৃত্যে *নাট্যশাস্ত্র* বা *অভিনয় দর্পণ* থেকে কিছু কিছু অংশ সংযোজন করা হচ্ছে।

ওড়িশী নৃত্যে মন্দির ভাস্কর্যে গ্রথিত নৃত্যভঙ্গিমাগুলিকে অনুকরণের চেষ্টা পরিলক্ষিত হয় এবং এই প্রচেষ্টা সার্থকতাও লাভ করছে। ওড়িশী নৃত্যে 'ত্রিভঙ্গ' ভঙ্গির ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়, তার কারণ ওড়িশী নৃত্যের অধিদেবতা হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ। বৈষ্ণবসাহিত্যের প্রভাব ওড়িশী নৃত্যে প্রবলভাবে পড়েছে। বিশেষ করে জয়দেবের অষ্টপদী একটি বিশেষ ভূমিকা নিয়েছে। সেই জন্য ত্রিভঙ্গের গুরুত্ব অনেক বেশি। কথিত আছে যে, রসিকচূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণ এই ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিতেই কদমতলায় দাঁড়িয়ে বাঁশি বাজাতেন। ত্রিভঙ্গ বলতে দেহকে তিনটি ভঙ্গিতে স্থাপন করতে হয়, যথা– পা দু'টিকে স্বস্তিতে রাখার জন্য একটি ভঙ্গের সৃষ্টি হয়। কটিদেশ ভঙ্গ অবস্থায় রাখার জন্য আর একটি ভঙ্গের সৃষ্টি হয় এবং মাথাটি একপাশে হেলিয়ে রাখার জন্যে আরেকটি ভঙ্গের সৃষ্টি হয়। এইভাবে দেহকে স্থাপন করে দণ্ডায়মান হওয়াকে 'ত্রিভঙ্গ' বলে।

প্রাচীন নাট্যশাস্ত্রে চারটি বৃত্তির উলেখ আছে। এই চারটি বৃত্তি হচ্ছে– কৈশিকী, আরভটী, ভারতী ও সাত্বতী। ওড়িশী নৃত্যগুরুরা মনে করেন এই নৃত্যে কৈশিকী বৃত্তিকে অবলম্বন করা হয়েছে। এই কৈশিকী বৃত্তি হচ্ছে 'শৃঙ্গারসম্ভবা' অর্থাৎ এতে লাস্যভাবের প্রাধান্য থাকে। ওড়িশী নৃত্যে নৃত্ত ও নৃত্য এই দু'টি ভাগ অতি স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়। এতে তাণ্ডব পদ্ধতিরও প্রয়োগ আছে। মুক্তেশ্বরের মন্দিরে তাণ্ডব পদ্ধতিতে দু'টি নৃত্যরতা নারীমূর্তি দেখা যায়। ওড়িয়া মহাভারতেও মেয়েদের তাণ্ডব নৃত্যের উলেখ আছে।

ওড়িশী নৃত্যের প্রসঙ্গে মন্দিরের দেবদাসী (মাহারী) ও গটিপুয়াদের অবদানের কথা অস্বীকার করা যায় না। ওড়িশী নৃত্যের ঐতিহ্যকে স্মরণীয় যুগ থেকে বহন করে এনেছে মাহারী ও গটিপুয়ারা (নর্তক)। এরাই যুগের অন্ধকার ভেদ করে বর্তমান শতাব্দী পর্যন্ত নৃত্যের আলোকবর্তিকা বহন করে এনেছে। মাহারী মন্দিরের সেবাদাসী ছিল। পুরীধামের জগন্নাথদেবের মন্দিরে, ভুবনেশ্বরের মন্দিরে, কোণারকের মন্দিরে ও কর্কটপুনর মঙ্গলারা মন্দিরে এরা দেবদাসী ছিল। পূর্বে মন্দিরের কাজ অনুসারে এই দেবদাসীদের শ্রেণিবিভাগ হয়েছিল। মাহারীদের মধ্যে এক শ্রেণি আছে যাদের 'সম্পরদা নিয়োগ' বলা হয়ে থাকে। এরা মন্দিরের নানা উৎসবের শোভাযাত্রায় নাচত। যেমন– রথযাত্রা, চন্দনযাত্রা, উঠাপন উৎসব, দোলযাত্রা, ঝুলনযাত্রা ইত্যাদি। অবশ্য এখন কোন উৎসবে এই ধরনের নাচ হয় না। ১৫৬৮ খ্রিস্টাব্দে বাংলায় আফগানশাসকরা মসনদে অধিষ্ঠিত হলে ওড়িশার স্বাধীনতা চিরতরে লুপ্ত হয়। কিন্তু এখানেই ওড়িশার দুর্ভাগ্যের শেষ নয়। সুলেমান কররানির সেনাপতি কালাপাহাড় তার প্রতিশোধ-স্পৃহা চরিতার্থ করতে হিন্দুদের মন্দির ও যাবতীয় হিন্দু ধর্মগ্রন্থ পুড়িয়ে দেয় এবং দারুণ অত্যাচার শুরু করে। একপর্যায়ে কালাপাহাড় পুরীর জগন্নাথদেবের মন্দির আক্রমণ করে বিগ্রহ চূর্ণ করে সমুদ্রে নিক্ষেপ করে। এর ফলে মন্দিরের কাজ আট বছর বন্ধ ছিল।

এরপর মোগল সম্রাটের হিন্দু সেনাপতি টোডর মলেস্বর হাতে আফগান শাসকদের পতন হয়। এই সুযোগে হিন্দু ও মোগল সেনাপতিদের সহায়তায় রামচন্দ্র আবার ওড়িশার সিংহাসনে আরোহণ করেন। জগন্নাথ দেবের পুজোও সুষ্ঠুভাবে আরম্ভ হয় এবং এই সময় মাহারীরা আবার মন্দিরের সঙ্গে যুক্ত হয়। রাজা রামচন্দ্র মন্দিরের

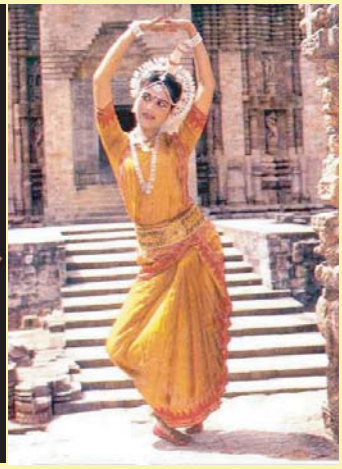

চারধারে আটটি রাস্তা নির্মাণ করেন। তার মধ্যে একটি মাহারীদের জন্য নির্ধারিত হয়েছিল। এই রাস্তা দিয়ে প্রতিহারীর মত 'মীনা নায়ক' মাহারীদের মন্দিরে নিয়ে যেত।

এরপর মারাঠাশক্তি ওড়িশার রাজ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়। এই সময় থেকে ওড়িশার রাজনীতিঅর্থনীতি, সংস্কৃতি, নৃত্যগীতবাদ্য, চিত্রভাস্কর্য– প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রাণসঞ্চার হয়। কিন্তু মন্দিরে নাচগান বন্ধ হয়ে যায়।

মাহারীদের পতনের পর ওড়িশায় সংগীতকে উজ্জীবিত করে তার ঐতিহ্য বহন করে চলছিল 'গটিপুয়া'রা। ওড়িয়া ভাষায় 'গটি' মানে একটি এবং 'পুয়া' মানে বালক। সুতরাং গটিপুয়া মানে একটি বালকের নৃত্য। এই গটিপুয়া নাচের কাছে বর্তমান ওড়িশী নৃত্য বিশেষভাবে ঋণী।

কবে, কোথায়, কেমন করে গটিপুয়া নাচের প্রচলন হয়েছিল কেউ বলতে পারে না। তবে আনুমানিক সপ্তদশ শতাব্দীতে এদের আবির্ভাব হয়। এদের সম্বন্ধে নানা রকম মতবাদ প্রচলিত আছে। ডা. কে সি পাণিগ্রাহীর মতে রাজা প্রতাপরুদ্রের সময় এই নৃত্য প্রচলিত হয়েছিল। কারণ মুসলমান রাজত্বের সময় পর্দাপ্রথার জন্য মেয়েদের নাচ বন্ধ হয়ে যায় এবং তার পরিবর্তে ছেলেরা নাচতে আরম্ভ করে। অনেকে আবার বলেন, বৈষ্ণবাচার্য রায় রামানন্দ গটিপুয়া নাচের প্রচলন করেন। কারণ মেয়েদের নাচের পরিবর্তে বালকদের নাচই তাঁরা বেশি পছন্দ করতেন। মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দের পরবর্তী বৈষ্ণবভক্তরা মেয়েদের নাচকে সমর্থন করতে পারেননি, ধর্ম প্রচারের বাহন হিসেবেও ছেলেদের এই নাচকে মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছিল। এইভাবে সঙ্গীতের ক্ষেত্রে গটিপুয়াদের প্রবেশ ঘটেছিল এবং পরে এই গটিপুয়ারা পেশাদার নাচিয়ে হয়ে উঠেছিল।

রাজা রামচন্দ্র এই গটিপুয়াদের বিশেষভাবে উৎসাহিত করেন। এইভাবে উনিশ শতক পর্যন্ত গটিপুয়াদের নৃত্যের গতি অব্যাহত থাকে। গটিপুয়ারা ওড়িশী পদ্ধতিতে নাচলেও তাদের নাচ মাহারীদের পদ্ধতি থেকে ভিন্ন ছিল, এমনকি বেশভূষা পরিচ্ছদ, সংগীত সম্পূর্ণ আলাদা ছিল। এখনও পর্যন্ত চন্দনযাত্রা ও ঝুলনের সময় অনেক গটিপুয়ার দল পুরীতে সমবেত হয় তাদের নৃত্য প্রদর্শনের জন্য। কিন্তু মাহারীদের মতন মন্দিরের ভেতর প্রবেশ করে নাচবার অধিকার তাদের নেই। সুতরাং দেখা যায় যে, মাহারী ও গটিপুয়াদের কাছে আধুনিক ওড়িশী নৃত্য বিশেষভাবে ঋণী।

ওড়িশী নাচ আগে বিচ্ছিন্নভাবে হত। কিন্তু এখন তাকে মার্জিত করে বিশেষে পদ্ধতিতে নাচা হয়। ওড়িশী নৃত্যকে যুগোপযোগী করে কয়েকটি অংশে ভাগ করা হয়েছে। এগুলি হচ্ছে– মঙ্গলাচরণ, বটুনৃত্য, পলবী, অভিনয় ও মোক্ষনাট।

মঙ্গলাচরণকে উদ্বোধন নৃত্য বলা যেতে পারে। এই নৃত্যে ইষ্টদেবতা ও রঙ্গভূমিকে শ্রদ্ধা ও প্রণাম জানানো হয়। 'ত্রিভঙ্গ'ভঙ্গিতে পুষ্টপুট হাতে ফুল গ্রহণ করে পাখোয়াজ বাদ্যের সঙ্গে সঙ্গে নৃত্যশিল্পী কয়েক পা অগ্রসর হয়ে পুষ্পাঞ্জলি দেয়। পুষ্পাঞ্জলির পর নৃত্যশিল্পী সমস্থানে দণ্ডায়মান হয়ে 'চৌক' ভঙ্গিতে নৃত্য আরম্ভ করে। বিভিন্ন চালের গতিকে ওড়িশী নৃত্যে 'চৌক' বলা হয়। এই নৃত্যের শেষে নৃত্যশিল্পী গোঁড়ালি উঁচু করে পাঞ্জার ওপর বসে দু'হাত দিয়ে ভূমি স্পর্শ করে কপাল স্পর্শ করে। তারপর হাত দু'টিকে বুকের কাছে নিয়ে অঞ্জলি হস্ত হয়। একে 'ভূমিপ্রণাম' বলা হয়। এরপর বন্দনা শুরু হয়। পার্বতী বা গণপতিকে উদ্দেশ্য করে এই বন্দনা করা হয়। শিব, দুর্গা, জগন্নাথদেবের উদ্দেশ্যেও শ্লোক গাওয়া হয়ে থাকে।

এর পরের অংশ বটুনৃত্য। শিব বা ভৈরব বটুকদেবের উদ্দেশ্যে এই নৃত্য নিবেদন করা হয়। এতে শুধুমাত্র তালাংশ থাকে। কতকগুলি সুন্দর, মনোরম ভঙ্গির সঙ্গে এই নৃত্য আরম্ভ হয়।

এই ভঙ্গিগুলির মধ্যে কতকগুলি বীণাবাদ্য, পাখোয়াজবাদ্য, মন্দিরাবাদ্য প্রভৃতির অনুকরণে করা হয়। এই নৃত্যের সঙ্গে কোন গান থাকে না। কতকগুলি শব্দ শুধু মুখে উচ্চারিত হয় এবং তার সঙ্গে বিভিন্ন ধরনের যতি করা হয়। কাতান বা তেহাই দিয়ে এক একটি অংশ শেষ করা হয়। ঝলা বা পহত্তাপ তা লে এই নৃত্য করা হয়ে থাকে।

এর পরের অংশ পলবী। পলবী মানে সুর, তাল অথবা নৃত্যের বিস্তার। স্বরপল বীতে যে রাগটি গাওয়া হয় তার রসমূর্তিটিকে প্রস্ফুটিত করে তোলা হয় নৃত্যসহযোগে। পলবীতে স্বর সহযোগে 'উকুত' বা বোল উচ্চারিত হয়। এর সঙ্গে পায়ের তাল রেখে নৃত্যশিল্পী চোখের ভ্রূর ও ঘাড়ের নানা ভঙ্গী করে। একে 'নখী' বলা হয়। এরপর গান ও তালের সঙ্গে নৃত্য শুরু হয়। পলবীতে তাল ও স্বর অথবা রাগকে সমান প্রাধান্য দেওয়া হয়।

এর পরের অংশে অভিনয় করা হয়ে থাকে। সাধারণত গীতগোবিন্দ থেকে গাওয়া হয় এবং তার সঙ্গে অভিনয় করা হয়ে থাকে। এতে ভাব ও রসের পূর্ণ বিকাশ থাকে।

সর্বশেষ 'মোক্ষনাটে' নৃত্যের পূর্ণ প্রয়োগ হয়ে থাকে। প্রাচ্যে বিশেষ করে ভারতবর্ষে সকলেরই মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে 'মোক্ষলাভ'। নৃত্যশিল্পীরা এই নৃত্যের মাধ্যমে মোক্ষলাভ করতে চান, এই অংশে শুধু সঙ্গীত যখন শেষ হয় শিল্পী তখন মোক্ষলাভের অভিনয় করেন। শুধুমাত্র পাখোয়াজের বোলের সঙ্গে এই নৃত্য করা হয়।

ওড়িশী নৃত্যের হস্তভেদ ও পাদভেদের অভিনয় হয়ে থাকে। ওড়িশী নৃত্যের নিজস্ব শাস্ত্র আছে। বেশ-ভূষা, ভঙ্গিতে, লাস্যে ও সংগীতে ওড়িশী নৃত্য অনন্য এবং ভারতীয় নৃত্যের জগতে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে নিয়েছে। শুধু তাই নয়, অবিরাম পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে এর গতি অব্যাহত রয়েছে।

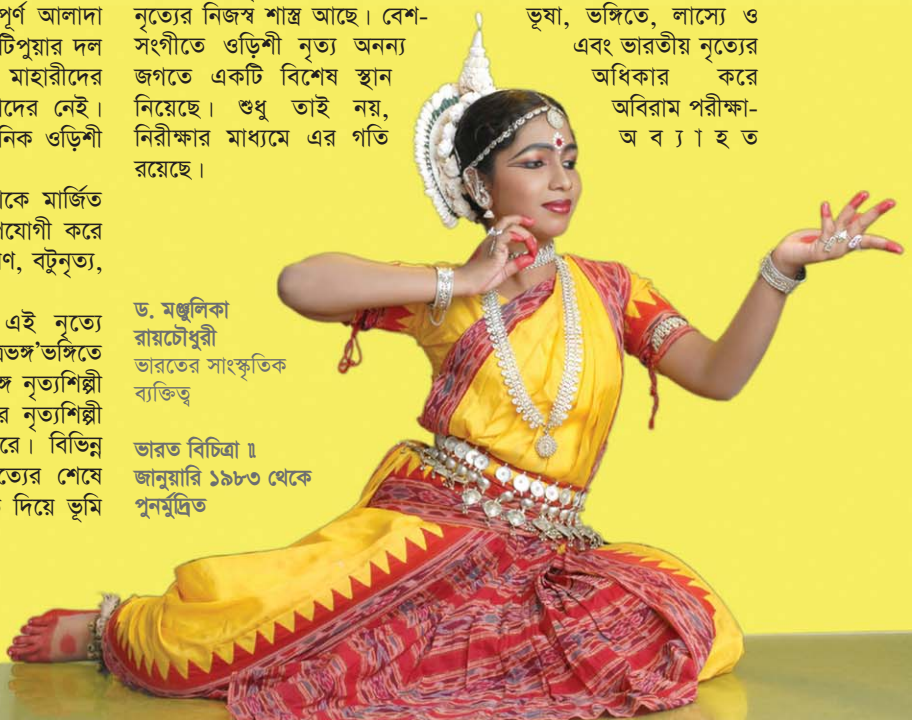

ড. মঞ্জুলিকা রায়চৌধুরী
ভারতের সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব

ভারত বিচিত্রা ॥ জানুয়ারি ১৯৮৩ থেকে পুনর্মুদ্রিত

Dove
hair therapy

Say no to gaps in your hair.

Dove helps rebuild damaged hair at cellular level*.

Roughness, dryness and breakage are signs that tell you that your hair is weak and damaged at its core. Try new Dove Intense Repair with Keratin Actives. It goes deep within each strand to help reconstruct your hair from the cellular level*. Strengthen your hair against damage* and make it beautiful with Dove.

with keratinactives

*Based on lab test with daily use

Ogilvy & Mather

পাখিবুড়ো

বেলাল চৌধুরী

রক্তাক্ত হৃদয়ে, হাতের গুলতি ফেলে অপরিসীম অপরাধেবোধ থেকে
চোখে দূরবীণ লাগিয়ে সেই যে নিলেন পিছু চড়ুই পাখিটির,
ছুটে চললেন আমৃত্যু দূরাধিগম্য অরণ্য থেকে অরণ্যান্তরে
বেড়ালেন চষে আসমুদ্রহিমাচল, নীলিমায় উড্ডীন পাখপাখালি...

জীবনভর একই ধ্যান একই জ্ঞান, পাখি আর পাখি শুধু,
হরেক জাতের পাখি-অন্ত প্রাণ একাগ্রচিত্ত, স্বাধীনচেতা
অথচ পাখিরা, কে না জানে কত অস্থির ও চঞ্চলমতি
এই মুহূর্তে এ-ডাল আবার পর মুহূর্তে অন্য ডাল
ফুড়ুৎ করে এক নিমেষে এ-গাছ থেকে ও-গাছ–

মাছরাঙা, ল্যাজঝোলা, গগনবেড়, বক, সারস, টিয়া, বুলবুলিদের মেলা
পাখি-পড়ুয়া চিরযুবাটি বিহঙ্গদের নিয়েই রইলেন মেতে
দেখলেন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে নিরন্তর তাদের জাতপাত ও ধাত,
নখরে তৃণগুচ্ছ আঁকড়ে, অগাধ শূন্যে মেলে ডানা
উড়ন্ত শ্রমিকের মত খড়কুটো দিয়ে বাঁধে নীড়
করণ-কৌশলে শুধু চঞ্চু সহায়, অসামান্য দক্ষতায়
পাতে সংসার একান্ত নিজস্ব জীবন-যাপন পদ্ধতি;

এসব নিয়ে কত না ছবি আঁকলেন, ফেললেন মাথার ঘাম পায়ে
এই সব মানবিক তুচ্ছাতিতুচ্ছের কে আর দেয় দাম!
শুধু পুষ্পের বাহারে চোখ জুড়ানো মন ভোলানো মায়া যেন,
তবু মনে হয় ছোট-বড় সব পাখিদের ঠিকুজি-কুলুজি আহরণ শেষে
জেগে আছে আজও তার সদাসতর্ক চোখজোড়া
কৌতূহলী কৌতুকমেশা অতন্দ্র পরকলায় মোড়া

আমি একবারই তার চোখে চোখ, হাতে হাত রেখেছিলাম
পাখি হয়ে উড়ে ঐ পাখিবুড়োর যাওয়ার আগে
ঢাকায় টিএসসি-র এক অপরিসর কুঠুরিতে
গোধূলির স্নান আলোয়, পাখিরা যখন কুলায় ফেরার পথে।

অগ্নিবাসা

রঞ্জনা রায়

ঐ দুর্দম বাজপাখির বাঁকা নখের আঁচড়ে ক্ষতবিক্ষত শরীর,
রক্ত ঝরে,
সভ্যতার আবরণ ঢাকা, পদ্মা-ভগবতী–
আজ বেআব্রু রাজপথে।
দীর্ঘ এলোচুলে লজ্জা ঢাকার ব্যর্থ প্রয়াসে,
অগণিত তারা নিথর হিমঘরে।
বিশ্বাসের খড়কুটোয় বেঁধেছিল নীড়,
সেই পাতা ঝরে যাওয়া পলাশের ডালে।
বাজের ডানায় কালকূট রাত আসে,
এক জন্মান্ধ হিংস্র পাতালে।
সে নরকের চৌকাঠে মাথা কোটে,
সেই পবিত্র মঙ্গল-ধ্বনির আশায়।
ধিকিধিকি জ্বলে আগুন– কলঙ্কিত ছাই খোঁজে,
তার মানব-পুরুষ,
এই ধূলিময় অগ্নিবাসায়।

রঞ্জনা রায় ভারতের কবি

একদিন অন্ধকার

হালিম আজাদ

একদিন অন্ধকার খুব রেগেমেগে বড়সড়ো অন্ধকার হবে।
মানুষের তৈরি অমাবস্যার তোপে পড়ে কোন এক সময়
ঘুমন্ত অন্ধকার জেগে উঠবে এইখানে,
ওরা আর বেড়াতে যাবে না দিনের আড়ালে। লোকালয়
ছেয়ে যাবে বিচ্ছিরি তোড়ে– অনন্তকাল– নির্দয় অন্ধকার।

ঝিম মেরে থাকা রাত্রির সকাল একদিন আর আসবে না।
ভোরের নিষ্পাপ পাতাকুঞ্জ কখনো আর ফিরে পাবে না
আলোর শিহরন।
সুখময় পৃথিবীর হৃদয় রাঙাতে পারবে না ক্ষণকাল, তখন
টুপটাপ ঝরে পড়বে সকল প্রেম।

একদিন অন্ধকার বিষাক্ত পিঁপড়ে হবে, খুব করে কেটে
নেবে সাজানো সভ্যতা, কেড়ে নেবে পৃথিবীর সকল সুন্দর।

সকলের শেষে এলে তুমি

নুরুন নাহার খান

ভোরের শিশির ঝরা কুয়াশার মাঠ
তপ্ত রূপোলি রোদে ধূসর হল
দুপুরের ঝরা পাতা বিকেলের স্নিগ্ধ বেলায়
বেমানান হবে বলে লুকিয়েছে মুখ
আকাশের সন্ধ্যাতারা ঝলমলে চাঁদ
ধীরে ধীরে উঠে এল মধ্যাকাশে
কালপুরুষ হয়ে সকলের শেষে এলে তুমি।

কালের বেহালা

দীপক লাহিড়ী

বেহালা হাতে সেই বৃদ্ধ মাঝে মাঝেই
আমাদের কলেজ গেটের উল্টো দিকে দাঁড়াতেন
যখন সুর জাগত কোলাহলের ভেতর
তখন আমাদের সময়ের কদম্ববেলা
মাঝে মাঝে বোমার বারুদগন্ধ হাওয়ায়
ধোঁয়া হয়ে উড়ে গেলে– বেহালা বেজে উঠত
মন জড়িয়ে যেত সুরের খেলায়
অনিদ্রার তলে তলে যেন বইছে জলধারা
সেই অঘ্রাণের অনুভূতিমালা ধরে শীত আসত
সমস্ত স্বপ্নের মধ্যে জাগত গায়ত্রীছন্দ
দিনের অকাতর আলোর মধ্যে জ্যোৎস্না
নামতে চাইত বারবার স্কটিশের পাঁচিল বরাবর
আমরা ছড়িয়ে পড়তাম নিজেদের শিকড় সুদ্ধ
আর হেদুয়াপার্কের রেলিং জুড়ে চলত তান বিস্তারের খেলা
আমরা কী জেগেছিলাম ঠিকঠাক সময়মত
তখন কিন্তু কালবেলার শুরু যা এখনও কাটেনি
হিরন্ময় এখনও বেজে যায় কালের বেহালা

দীপক লাহিড়ী ভারতের কবি

প্রদক্ষিণ অবিরাম

নমিতা চৌধুরী

তুমি কিছু দেবে বলেছিলে
বৃষ্টির টুপটাপ শব্দে
আমি তখন সময় গুণেছি
ভেঙেছি প্রতিটি কোষের আলজিভ
এখন পিছন ফিরে দেখি
কেন্দ্রবিন্দুতে আমারই প্রলম্বিত ছায়া
সেই আয়তন।

কেন যে পিছন ফিরে দেখা
নিজস্ব ভঙ্গিতে জানি সময় বদলে দেবে
দিন আর রাতের পোশাক।
আমি তো ফুলের মেধায় কাঁটার
শরীর গেঁথে মুকুট গড়েছি
আজ অবগাহনের দিন

মুদ্রায় তালে প্রদক্ষিণ করি অবিরাম
অবিরাম আভোগ সঞ্চারী।

নমিতা চৌধুরী ভারতের কবি

আরণ্যক দাবা

সোমনাথ রায়

পৃথিবীর নিমন্ত্রণে এসে আজ অনাহারে ফিরে গেলে ওরা
খসে গেল সমাজের গা থেকে নক্সাখচিত উজ্জ্বল চাদর।
অন্ধকারে বাস করে যাদের দু'চোখে ছিল স্বপ্নময় ভোর
তাদের চিরনিদ্রায় ফেলে রেখে ছুটে গেছে নির্বাচিত ঘোড়া
দাবার আড়াইচালে প্রতিবার লাফ দিয়ে; কিছু বিষফোঁড়া
গোদের ওপরে থাকে, তাদের জন্যেই তার পা ভারি, আদর।
মাঝে মাঝে বিড়ম্বনা, মাঝে মাঝে সংবাদ চেঁচিয়ে বলে চোর–
মানুষ সহজে সব ভুলে যায়, জলে ফিরে যায় জলঢোঁড়া।

পোশাক দিলে না, ভাত দিলে না, যৌনতা দিলে শুধু ভগবান
অড়ার দিলে না, জমি দিলে না, পানীয় জলে দিলে আর্সেনিক।
গুহায় ছিলাম ভাল, গুহার ভেতরে ফের নিয়ে যাও তুমি
আবার ফিরিয়ে দাও বনমানুষের দেশে বন্য অবস্থান।
দাবার চৌষট্টি ঘরে আমাদের আলো নেই, আঁধার দৈনিক
কুরে কুরে খায় আর পা থেকে হারিয়ে যায় আরণ্যক ভূমি।

সোমনাথ রায় ভারতের কবি

আমার নতুন হাঁটাচলা

সাম্য ভট্টাচার্য

মুখ, মেঘ। বদলে যাচ্ছে। 'আমি' নামক আয়নায়। ওরা
অনেক না-শোনা রাগিণী, যে ক'টা শুনছি ভুলে যাচ্ছি।
পড়ে থাকছে ইচ্ছে। অনিচ্ছায় দুলছে জামা। আবরণহীন
একটি জামার নাম 'ভালবাসা'। ভালবাসার কাঁটাতার।
ওপারে বৃষ্টি ফিরে আসা।

'তুমি' নামক আয়নায় অনেক স্লাইড শো-য়ে কখনো
আমার নাম ভেসে ওঠে স্মৃতিতে। স্মৃতিহীনরা স্নান
করছে তোমার স্মৃতিতে।

ঘামের ফুল; ঝুললে ইরেকশন, বেকেটের কথামত;
অযৌন সাইনবোর্ডে কারুর হাতের কাজ, তার হাতে
মাস্টারবেশন-পত্রিকা;– আত্মহত্যার মায়ায় জীবন
গিটার হাতে

সেখান থেকে শুরু সমুদ্রের

সাম্য ভট্টাচার্য ভারতের কবি

বিদেশ সচিব সুজাতা সিংয়ের সঙ্গে বাংলাদেশের উপাচার্য প্রতিনিধিদল

সৌহার্দ

উপাচার্যদের ভারত সফর

ড. এস এম নজরুল ইসলাম

বাংলাদেশস্থ ভারতীয় হাই কমিশন ১৪১৯ ডি সেম্বর ২০১৩ বাংলাদেশের ৯টি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সমন্বয়ে একটি প্রতিনিধিদলের ভারত সফরের ব্যবস্থা করেন। প্রতিনিধিদলে চারটি সরকারি এবং পাঁচটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এ সফরের উদ্দেশ্য ছিল ভারতের দিল্লি, আগ্রা ও কলকাতার কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করা। এর মাধ্যমে সে দেশে বিদ্যমান উচ্চতর শিক্ষা ও গবেষণা ব্যবস্থার বিশেষ দিকগুলো সম্পর্কে ধারণা পাওয়া এবং উভয় দেশের বিশ্ববিদ্যালয় ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে উচ্চপর্যায়ে পারস্পরিক মত বিনিময় করা। উচ্চশিক্ষা হল আন্তর্জাতিক পর্যায়ের এবং তার জন্যে প্রয়োজন বিভিন্ন দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে যোগাযোগ ও জ্ঞান বিনিময় করা। এ সফর স্ব স্ব প্রয়োজন ও অগ্রাধিকারগুলোর উপর ভিত্তি করে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে আরেকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের দীর্ঘমেয়াদী যোগাযোগ প্রতিষ্ঠার সুযোগ করে দিয়েছে। বাংলাদেশের নতুন শিক্ষানীতি২০১০ উচ্চশিক্ষার দিগন্ত প্রসারিত করেছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন,"বাংলাদেশী বিশেষজ্ঞগণই বাংলাদেশের সমস্যা সমাধান করবেন।" বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোই বিশেষজ্ঞ তৈরির দায়িত্বভার নিতে পারে। ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়/প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে পারস্পরিক সহযোগিতা উচ্চশিক্ষার মান বৃদ্ধি করবে। এই উদ্দেশ্যে উভয় দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের পারস্পরিক সফর বিনিময় কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে পারে।

বাংলাদেশের প্রতিনিধিরা এনআইসি (ন্যাশনাল ইনফরমেশন সেন্টার)এ নেটওয়ার্কিংএর উপর একটি প্রদর্শনীতে উপস্থিত ছিলেন। এনকেএন (ন্যাশনাল নলেজ নেটওয়ার্ক) প্রকল্পের অধীনে ভারতের সকল বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান সংযুক্ত করা হয়েছে। ভারতের সকল জেলায় এ নেটওয়ার্ক সম্প্রসারিত করা হয়েছে। এটি ভারতের সকল শহরের গবেষকদের মাঝে সহযোগিতা ও যোগাযোগের ক্ষেত্রে সহায়ক হবে। কার্যকরী দূরশিক্ষণ সেবা প্রদানের জন্যও এটি একটি প্ল্যাটফর্ম হিসেবে কাজ করবে। যাতে করে ছাত্র/ছাত্রী ও শিক্ষকগণ প্রয়োজনীয় মুহূর্তে পারস্পরিক

গবেষণা অঙ্গনের অনেক ক্ষেত্র যেমন পানি, বিদ্যুৎ শক্তি, পরিবেশ ইত্যাদি বিষয়ে উভয় দেশের গবেষকদের সাধারণ আগ্রহ রয়েছে। অনেক ক্ষেত্রেই সহযোগিতা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। এ বিষয়ে জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এবং শিক্ষকমণ্ডলী গভীর আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণার পরিবেশ এবং সুযোগ সুবিধা প্রতিনিধি দলকে আকৃষ্ট করে। মানবিক ও সামাজিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কাজ করার জন্যে বিশ্ববিদ্যালয়টির দারুণ সুনাম রয়েছে। এখানকার শিক্ষকমণ্ডলী সুপরিচিত পণ্ডিত যারা গবেষণায় অবদান রাখছেন এবং শিক্ষা ও গবেষণায় অঙ্গীকারাবদ্ধ।

যোগাযোগ করতে পারেন। বাংলাদেশের মত দেশে যেখানে শিক্ষার সুযোগ সীমিত সেখানে এই ধরনের শিক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। এ নেটওয়ার্কএর মাধ্যমে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের শ্রেণীকক্ষের লেকচার ও গবেষণা নির্দেশনা সম্পর্কিত তথ্যের আদানপ্রদান করতে সক্ষম। বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের মধ্যে তথ্য বিনিময়ের জন্য বিডিআরইএন (বাংলাদেশ রিসার্চ এন্ড এডুকেশন নেটওয়ার্ক) নামে একটি প্রকল্প গ্রহণ করেছে। শিক্ষা ও গবেষণা নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠা করতে ভারতের ন্যাশনাল ইনফরমেশন সেন্টার (এনআইসি)এর সঙ্গে বিডিআরইএনএর সংযোগ থাকতে পারে। টিইআইএন (ট্রান্স ইউরেশিয়া ইনফরমেশন নেটওয়ার্ক) বাংলাদেশে বিডিআরইএনএর মাধ্যমে শিক্ষা ও গবেষণার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সঙ্গে সংযোগ প্রতিষ্ঠা করেছে।

প্রতিনিধিদল ভারতের কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী ও ভারতের বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের চেয়ারম্যানএর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। সেখানে কমিশন ভারতীয় শিক্ষা কাঠামোর সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়। উভয় দেশের উচ্চশিক্ষা কাঠামো প্রায় একই রকম। ২০০১ সালের পর ভারতে বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০০১ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা যেখানে ছিল ২৫৬টি, ২০১৩ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ৭০০টি। ফলে ছাত্রছাত্রী ভর্তির সংখ্যা ২০০১ সালে যা ছিল তার প্রায় দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলাদেশেও বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ভারতের মত ছাত্রছাত্রী ভর্তির সংখ্যাও ঊর্ধ্বমুখী। উভয় দেশের উচ্চশিক্ষা পদ্ধতির ক্ষেত্রে এ রকম অনেক মিল আছে। ভারতে স্নাতকোত্তর পর্যায়ের ছাত্রছাত্রীদের উল্লেখযোগ্য একটি অংশ গবেষণায় প্রবেশ করে কিন্তু বাংলাদেশে সে সংখ্যা তত বেশি নয়।

গবেষণা অঙ্গনের অনেক ক্ষেত্র যেমন পানি, বিদ্যুৎ শক্তি, পরিবেশ ইত্যাদি বিষয়ে উভয় দেশের গবেষকদের সাধারণ আগ্রহ রয়েছে। অনেক ক্ষেত্রেই সহযোগিতা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। এ বিষয়ে জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এবং শিক্ষকমণ্ডলী গভীর আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণার পরিবেশ এবং সুযোগ সুবিধা প্রতিনিধি দলকে আকৃষ্ট করে। মানবিক ও সামাজিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কাজ করার জন্যে বিশ্ববিদ্যালয়টির দারুণ সুনাম রয়েছে। এখানকার শিক্ষকমণ্ডলী সুপরিচিত পণ্ডিত যারা গবেষণায় অবদান রাখছেন এবং শিক্ষা ও গবেষণায় অঙ্গীকারাবদ্ধ। সামাজিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে গবেষণার কাজে সহযোগিতা স্থাপনের লক্ষ্যে প্রতিনিধি দল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এবং শিক্ষকমণ্ডলীর সঙ্গে মত বিনিময় করেছেন।

দলটি ওপি জিন্দাল গ্লোবাল ইউনিভার্সিটি নামের একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন করে। এটি একটি নতুন বিশ্ববিদ্যালয় যার পাঁচটি একাডেমিক স্কুল রয়েছে। শিক্ষা এবং গবেষণার উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত এর ভৌত সুবিধাদি অত্যন্ত চমৎকার। এখানকার শিক্ষকরা গবেষণা, প্রকাশনা ও শিক্ষাদানে অঙ্গীকারাবদ্ধ। উচ্চশিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য দুই দেশের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর পারস্পরিক সহযোগিতা কার্যকরী ভূমিকা পালন করবে।

ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ম্যানেজমেন্ট (আইআইএম), কলকাতার স্নাতকোত্তর প্রোগ্রামকে *দি ফিনান্সিয়াল টাইমস* পত্রিকা গ্লোবাল মাস্টার্স ইন ম্যানেজমেন্ট র‍্যাঙ্কিং২০১৩য় ২০র মধ্যে স্থান দিয়েছে। আইআইএমএর প্রোগ্রামটি ভবিষ্যৎ সাংগঠনিক নেতৃত্ব তৈরির জন্য চমৎকার। আইআইএমএর অনেক গ্রাজুয়েট বিভিন্ন শিল্পকারখানা ও সংস্থায় অত্যন্ত সফল ব্যবস্থাপক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে এ প্রতিষ্ঠানটির যোগাযোগ রয়েছে। এটি একটি স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে তার অভীষ্ট লক্ষ্য পূরণে কাজ করে যাচ্ছে। এর মাধ্যমে উভয় দেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতার উজ্জ্বল সম্ভাবনা রয়েছে।

প্রতিটি জাতির উন্নয়ন কার্যক্রম বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দিয়ে পরিচালিত। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ছাড়া উচ্চশিক্ষাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। প্রত্যেক দেশেরই নতুন নতুন পণ্যদ্রব্য উৎপাদনের জন্য লভ্য সম্পদ প্রক্রিয়াজাত করার প্রযুক্তি উন্নয়নের কিছু নীতিমালা আছে। বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও গণিতের ক্ষেত্রে দু'টি বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা আরো ফলপ্রসূ হবে। ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় এবং প্রতিষ্ঠানগুলো বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে তাদের অবদানের জন্য সুপরিচিত। কিন্তু প্রতিনিধিদলটি প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনের সুযোগ পায়নি। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে দু'দেশের মধ্যে সহযোগিতার সম্পর্ক আরও কার্যকর করতে হবে। তবে প্রতিনিধিদলের গবেষকদের জন্য থিংক ট্যাঙ্ক হিসেবে বিবেচিত অবজারভার রিসার্চ ফাউন্ডেশন (ওআরএফ) পরিদর্শন করার সুযোগ হয়েছিল। ওআরএফ্ক এর গবেষকদল ও এর ফেলোদের সঙ্গে একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ওআরএফ-এর প্রকাশনাসমূহের উপর একটি সামগ্রিক ধারণা নেওয়ার সুযোগ হয়েছিল প্রতিনিধিদলের। এ প্রতিষ্ঠানটি ভারতের ভিতরের এবং বাইরের অনেক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সহযোগিতামূলক গবেষণা করে থাকে। এটি প্রতিবেশী দেশসমূহের প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেও সহযোগিতামূলক গবেষণা করে আসছে। অনেক সম্ভাব্য ক্ষেত্রে গবেষণা ব্যবস্থাপনার জন্যে এটি বিভিন্ন দলে কাজ করে থাকে। এখানে বাংলাদেশ সম্পর্কিত তথ্য সংবলিত কিছু নথিপত্রও পাওয়া যায়। ওআরএফ্কএর গবেষকরা বাংলাদেশের গবেষকদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে থাকেন। বাংলাদেশী প্রতিষ্ঠানসমূহের সঙ্গে পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে এর গবেষণার সক্ষমতা আরও শক্তিশালী করার সুযোগ রয়েছে।

ভারতের কেন্দ্রীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও বিদেশ সচিবের সঙ্গেও প্রতিনিধিদলের সাক্ষাতের সুযোগ হয়েছিল। তাঁদের সামনে বাংলাদেশী প্রতিষ্ঠানসমূহের সঙ্গে স্নে দেশের সহযোগিতার ক্ষেত্রগুলো তুলে ধরা হয়। এ সহযোগিতামূলক কার্যক্রমে তাঁদের প্রয়োজনীয় সহায়তা দানের জন্যও বিনীত অনুরোধ জানানো হয়।

সফরকারী দলটির দিল্লি, আগ্রা এবং কলকাতায় অবস্থান খুবই উপভোগ্য হয়েছিল। এটি ছিল খুবই কার্যকর একটি সফর। বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষার বিদ্যমান অবস্থা জানার জন্য ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর উপাচার্যগণও অনুরূপ ফিরতি সফর করতে পারেন। বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতীয় হাই কমিশনার এবং হাই কমিশনের কর্মকর্তাদের আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। ভারতে আমাদের সফরের সময় ভারত সরকারের বৈদেশিক সম্পর্ক বিভাগের সকল সাহায্য, সহযোগিতা ও আতিথেয়তার প্রশংসা করি।

প্রফেসর ড. এস এম নজরুল ইসলাম
উপাচার্য, বুয়েট, ঢাকা

উৎসব

গানের ভেলায় বেলা অবেলায়

পণ্ডিত শিবকুমার শর্মার সাক্ষাৎকার

মার্গ সঙ্গীতের মহোৎসব বসেছিল ঢাকায় ২০১৩র শেষভাগে। এই উৎসব বাংলাদেশের গৌরব-মুকুটে এক নতুন পালক। ভারতের আইটিসি এসআর-এর সহায়তায় বেঙ্গল ফাউন্ডেশনের দ্বিতীয় আয়োজন ছাপিয়ে গিয়েছিল প্রথমকে। দর্শকসারিতে নানা প্রজন্মের উপস্থিতিতে প্রতিসরিত হয়েছে সুরের জয়গাথা, রঙ আর ঔজ্জ্বল্য। বিশেষত, তারুণ্যের সঙ্গীতোচ্ছ্বাস এই আয়োজনের মহার্ঘ প্রাপ্তি। রাতের মৃদু শীত, জাগরণ, রাজনীতির অস্থির পরিস্থিতি আর ঝুঁকি সত্ত্বেও সঙ্গীতের প্রতি মানুষের নিখাদ অনুরাগ চিনিয়েছে নতুন এক বাংলাদেশকে কিংবা বলা যেতে পারে, এটাই প্রকৃত প্রতিচ্ছবি, যা আমরা ভুলতে বসেছিলাম। বেঙ্গল ফাউন্ডেশনের বদান্যতায় আরও অন্তত এক দশক বাঙালি প্রতিবছর একই সময়ে সুরের ঝর্নাধারায় অবগাহনের সুযোগ পাবেন। আইটিসি এসআর-এর সহায়তা আর পৃষ্ঠপোষকদের মহানুভবতাও সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য। এ সঙ্গীত উৎসবের অন্যতম প্রধান জাদুকরী আকর্ষণ ছিল পণ্ডিত শিবকুমার শর্মার সন্তুর পরিবেশনা। বক্ষ্যমান সাক্ষাৎকারে উঠে এসেছে সন্তুর সম্রাটের একান্ত কিছু কথা। পণ্ডিত শিবকুমার শর্মা অনেক কথা বলেছেন তাঁর সুযোগ্য পুত্র রাহুল শর্মাকে নিয়েও। সন্তুরে শাস্ত্রীয় সঙ্গীত পরিবেশনার পরম্পরার ভার এখন যাঁর ওপর ন্যস্ত। রাজেশ্বরী প্রিয়রঞ্জিনীর সঙ্গে একান্ত সাক্ষাৎকারে পণ্ডিত শিবকুমার শর্মা...

শুভ সন্ধ্যা পণ্ডিত শিবকুমার শর্মা। আপনাকে অভিবাদন। কেমন আছেন, কেমনই বা লাগছে?

এ নিয়ে বেশ কয়েকবারই এলাম বাংলাদেশে। তবে এবারের আসা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এত বড় বিশাল আয়োজন, মার্গ সঙ্গীতকে ঘিরে এক মহাযজ্ঞ, এত বিপুল দর্শক, বেঙ্গল ফাউন্ডেশনের অভূতপূর্ব উদ্যোগ ঘিরে একজন শিল্পী ও শ্রোতা হিসেবে আমি সত্যি খুবই আবেগাপ্লুত, আশান্বিত, আনন্দিত ও মোহিত। সে সঙ্গে আমার জীবনে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হল, আমার শিষ্য ও সন্তান রাহুল শর্মা এবার এ উৎসবে সন্তুর পরিবেশন করছে। আমি বেঙ্গল ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান আবুল খায়েরকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ দিতে চাই এ জন্যে যে, এই উপমহাদেশে ক্লাসিক্যাল মিউজিককে তিনি এক বিশেষ গৌরবজনক ইতিহাসের অনন্য স্বাক্ষর হিসেবে প্রমাণ করেছেন। জীবনে অনেক দেশে বাজিয়েছি; কিন্তু এত বিপুল দর্শকের উপস্থিতি, আগ্রহ, আবেগ আমাকে সত্যিই স্পর্শ ও আনন্দিত করেছে।

আপনার শৈশব নিয়ে কিছু বলবেন কি?

আমার জন্ম ১৯৩৮ সালের ১৩ জানুয়ারি জম্মুকাশ্মীরে। পাঁচ বছর বয়স থেকে বাবার কাছেই শাস্ত্রীয় সঙ্গীত ও তবলায় হাতেখড়ি। বাবা ছিলেন জম্মুর স্বনামধন্য মার্গ সঙ্গীতশিল্পী উমা দত্তশর্মা। সন্তুর জম্মুকাশ্মীরের একটি প্রাচীন লোক বাদ্যযন্ত্র। বাবা সেই সন্তুর নিয়ে স্বপ্ন দেখতে শুরু করলেন। ১৩ বছর বয়সে বাবা আমার হাতে সন্তুর তুলে দিলেন। প্রথম বাজালাম বোম্বেতে। তখন আমার বয়স ১৭। আমি সন্তুরে ইন্ডিয়ান ক্লাসিক্যাল মিউজিককে নতুন করে আবিষ্কার করতে শুরু করলাম, যা আজও করেই চলেছি।

এরপর আপনার ফিল্মে সম্পৃক্ততা এবং পণ্ডিত হরিপ্রসাদ চৌরাসিয়ার সঙ্গে আবিস্মরণীয় যুগলবন্দির স্বর্ণযুগ নিয়ে কিছু বলুন?

ফিল্মে প্রথম ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক কম্পোজ করি ১৯৫৬ সালে সান্তারামের 'ঝনক ঝনক পায়েল বাজে'র মাধ্যমে। আমার একক এ্যালবাম বের হয় ১৯৬০ সালে। পণ্ডিত হরিপ্রসাদ চৌরাসিয়ার সঙ্গে যৌথভাবে শুরু হল এক স্মরণীয় সঙ্গীত যাত্রা। ১৯৬৭ সালের কথা। আমাদের যুগল যাত্রাকে 'শিবহরি' বলা হত। পণ্ডিত হরিজির সঙ্গে যুগলবন্দি শ্রোতারা খুব গভীরভাবে গ্রহণ করেছিলেন। একসঙ্গে অনেক কাজের মধ্যে আমরা *সিলসিলা, ফাসলে, চাঁদনী, লামহে,* ডরসহ অনেক ছবিতে কাজ করি, যা সত্যিই স্মরণীয়।

জানতে চাইছিলাম আপনার পরিবারের কথা...

আমার স্ত্রীর নাম মনোরমা। ঈশ্বর আমাদের দু'টি পুত্র সন্তান দিয়েছেন– রোহিত ও রাহুল। মনোরমা আমাদের জীবনের পরম আশ্রয়, আমাদের শিল্পীজীবন বহমান রাখতে তাঁর ভূমিকা অসীম। খুব স্বাভাবিকভাবেই শিল্পীদের জীবনাচরণ একটু বেশিই স্পর্শকাতর, অন্যদের চেয়ে আলাদা।

আপনার ছেলে রাহুল শর্মা, তিনিও আজ স্বনামখ্যাত সন্তুরবাদক, মিউজিশিয়ান। কীভাবে দেখেন এই পরম্পরাকে?

আমাদের দু'টি ছেলে– রোহিত ও রাহুল। ওদেরকে খুব স্বাভাবিকভাবে ওদের মত করে বাড়তে দিতে আমি ও মনোরমা পছন্দ করতাম। কোন কিছু জোর করে ওদের ওপর আমরা চাপিয়ে দিইনি। কিন্তু রাহুলের পাঁচ বছর বয়স থেকে লক্ষ্য করলাম ও অন্যরকম। এক পর্যায়ে উপলব্ধি করলাম রাহুল ঈশ্বরপ্রদত্ত প্রতিভা নিয়ে জন্মেছে। আমি মনে করি, কোন শিল্পমাধ্যমেই 'শিল্পী'কে তৈরি করা যায় না, শিল্পী ঈশ্বরের আশীর্বাদ। আমার স্ত্রীকে আমি তক্ষুণি বলেছিলাম, এ ছেলেটিকে আমাদের অন্যভাবে খেয়াল করতে হবে। রাহুল আমার শিষ্য ও সন্তান। আমি

যখন ওর গুরু তখন আমি ওকে একজন পূর্ণ শিল্পী হিসেবে অনুভব করেছি। একজন সন্তুর শিল্পী হিসেবে ওকে আমি শ্রদ্ধা করি। একটা বিষয় আমার নজর কেড়েছে, সেটা হল ওর স্বকীয়তা। ও শিক্ষাগ্রহণ করেছে নিবিড়ভাবে কিন্তু যখন নিজে সৃষ্টি করেছে তখন সেখানে এনেছে নতুনত্ব ও নিজস্ব স্টাইল। খুব স্বাভাবিকভাবেই পরম্পরার এক বিশেষ মূল্য রয়েছে। আমিও আমার বাবার কাছ থেকে পেয়েছি। সন্তুরের ক্ষেত্রে রাহুলের সার্থকতা হল, সে আমার ছেলে ও শিষ্য হলেও সে তার ক্ষেত্রে নিজস্বতাকে প্রয়োগ করছে। আরেকটি বিষয় বলব, ও একজন পূর্ণাঙ্গ মিউজিক কম্পোজার। ঐতিহ্য ও আধুনিকতার এক অদ্ভুত সমন্বয় রয়েছে ওর কম্পোজিশনে।

রাহুলকে যখন আমি শেখাতে শুরু করি তার প্রশ্নের শেষ থাকত না। পরে তাকে শিখিয়েছি, গুরুজির সঙ্গে কীভাবে বিহেভ করতে হয়। যখন সন্তুর নিয়ে আমি ও রাহুল, তখন আমি গুরু, ও শিষ্য। সেই মুহূর্তে বাবাস ন্তানের অস্তিত্ব উহ্য! ওর মাকে বলতাম, 'তোমার ছেলেকে বল গুরুজিকে একটু কম প্রশ্ন করতে হয়... হাহাহা!

পণ্ডিত শিবকুমার শর্মা, আমি যখন বাজান অনেক সময় দেখা গেছে আপনি আলো কমিয়ে নেন, বাজানোর সময় আপনার অনুভূতি কেমন হয়, শেয়ার করবেন? তখন আপনি কোন পৃথিবীতে থাকেন?

সত্যি বলতে কি, বাজানোর আগে থেকেই আমি আমার মধ্যে থাকি না। আমি একেবারেই আত্মমগ্ন হয়ে পড়ি। আর প্রতিটি পারফরম্যান্সই আমার কাছে আরাধনাতুল্য। একটু কম আলোতে মগ্ন হতে সুবিধা হয়। যে কোন পারফরম্যান্সের শুরুতে আমি দর্শকদের এক নজর দেখে নিই। আর সে মুহূর্তেই আমার মধ্যে আবেগ ও দায়িত্বশীলতা কাজ করে। এত মানুষ আমার বাজনা শুনতে এসেছেন, এঁদের তো আমি নিরাশ করতে পারি না। বাজানোর মুহূর্তে আমি হারিয়ে যাই, সত্যি বলতে পার্থিব পৃথিবীতে বসে বাজাই... কিন্তু সুর তো পার্থিব নয়, কোথা থেকে এ সুর আসে? ঈশ্বর ও পৃথিবীর মাঝে দূরত্ব ঘুচে যায়... সত্যিই সে তরঙ্গে আমি ভেসে যাই এবং এই অপার্থিব আকর্ষণের তরঙ্গধ্বনি নিরন্তর আমার শিল্পীসত্তাকে বাঁচিয়ে রাখে।

রাহুল শর্মার পারফরম্যান্স ও ফিউশন সম্পর্কে কিছু বলবেন? রাহুল শর্মার সঙ্গে শিবকুমার শর্মাকে কীভাবে মেলাবেন?

রাহুল শর্মার মিউজিক জার্নির সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ সে শিবকুমার শর্মার সন্তান ও শিষ্য। সেই চ্যালেঞ্জটিতে সে উত্তীর্ণ। কারণ রাহুলের নিবেদনের স্বকীয় ভাষা আছে যেখানে ঐতিহ্য ও ওয়েস্টার্ন সঙ্গীত এক সঙ্গে খেলা করে। সে একজন দক্ষ মিউজিক কম্পোজার। ইতোমধ্যেই সে বিশ্বখ্যাত স্যাক্সোফোনবাদক কেনিজির সঙ্গে যুগলবন্দি করেছে। তাদের 'নমস্তে ইন্ডিয়া' শীর্ষক অ্যালবাম শ্রোতাপ্রিয়তা পেয়েছে। আমি তাকে সন্তুরের সহশিল্পী মনে করি এবং সেই দৃষ্টিভঙ্গিতেই তাকে আমি শ্রদ্ধা করি। শিল্পী স্রষ্টার সৃষ্টি, রাহুল একজন বর্ন্ আর্টিস্ট। আমি তার একজন অনুরাগী। এক্ষেত্রে রাহুলের জায়গায় অন্য কেউ হলেও তাই বলতাম। শিবকুমারপরম্পরার সুযোগ্য অধিকারীর যোগ্যতা ও সাধনা রাহুল তার একাগ্রতায় বহমান রেখেছে। সে তার চর্চায় নিয়ত মগ্ন, সৃষ্টিতে সৃজনশীল।

পণ্ডিত শিবকুমার শর্মা বাজনার পাশাপাশি আপনার সৌন্দর্য, পোশাক, স্টাইল, এসবেরও অনেক গুণমুগ্ধ আছেন। জানতে চাই আপনার ফ্যাশন স্টেটমেন্ট, আপনার স্টাইলের কথা, হেয়ার স্টাইলের কথাও।

আমি কখনোই আমার বোধের বাইরে কিছু আরোপ করতে অভ্যস্ত নই যা আমাকে স্বাভাবিক রাখে সেটা আমার ভাল লাগে। চুল নিয়ে সেভাবে প্ল্যান করে কিছু হয়নি। যেভাবে ভাল লাগে, সেভাবেই আছে। তবে পাঞ্জাবির উজ্জ্বল রঙ, রেশমি কোমলতা, আমার পারফরম্যান্সের মুডে ভূমিকা রাখে। কারণ সন্তুরের তরঙ্গে আমি নিমগ্ন হই, সেই ছন্দের উচ্ছ্বাস আমার পোশাকেও থাকে। এক ধরনের হারমনি সৃষ্টি করে। সহজ ভাষায় বলা যায় ভাল লাগা। বাজানোর সময় আমি খুবই অন্য জগতে থাকি। বাজানোর মুহূর্তটা আমার কাছে একই সঙ্গে অপার্থিব, সুন্দর ও ছন্দময়। এই হারমনিটা আমার পোশাকে হয়তো বা প্রাণিত।

প্রেম ভক্তি, নিবেদন নিয়ে কিছু বলবেন?

এই তিন মিলেই সন্তুরে আমার অস্তিত্ব, নিমগ্নতা ও বিভোরতা। পুরো অস্তিত্ব জুড়ে সেই তরঙ্গ বহতা নদীর মত তরঙ্গিণী।

আপনি তো ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতকেই আপনার সন্তুরের সুরে নতুন করে আবিষ্কার করেছেন...

আমার কাছে মনে হয় ঐতিহ্যের কাছে মৌলিক থাকাটা খুবই জরুরি। ঐতিহ্যগত বিশুদ্ধতার কাছেই ফিরতে হয়, ইকো হতে থাকে। আমরা যাই প্রয়োগ করি, ফিউশন করি– ক্লাসিক্যাল বেস থাকতেই হবে। এক্ষেত্রে আমার জীবনে আমি ক্লাসিক্যাল ভোকালিস্ট ছিলাম, তবলা বাজাতাম– এই দু'টি সত্তা আমাকে খুবই সহযোগিতা করেছে বলে আমার মনে হয়। আমার মনে হয়, আমি এখনো পিপাসার্ত শিক্ষার্থী। প্রতিটি কনসার্টই আমার কাছে নতুন অভিজ্ঞতা, অনিঃশেষ সুরের তৃষ্ণা।

সূত্র চারবেলা চারদিক

ভ্রমণ

তাওয়াং

অরুণাচলের পর্যটন শহর

প্রণব সাহা

এক সঙ্গে সেভেন সিস্টার্সের তিনটি রাজ্যে যাওয়া বাংলাদেশের যে কোন নাগরিকের পক্ষে অনেকটাই দুরূহ। আর নাগাল্যান্ডে বাংলাদেশীদের বিশেষ অনুমতি ছাড়া যাবার সুযোগ আছে কিনা তা নিয়েও সন্দেহ ছিল। মেঘালয় ও ত্রিপুরায় গিয়েছিলাম আগেই, তাই এবার একসঙ্গে অরুণাচল, অসম আর নাগাল্যান্ড দেখার সুযোগ হাতছাড়া করিনি। চিন-ভারত সীমান্তের খুব কাছেই তাওয়াংয়ের বরফঠাণ্ডা আর অসমের গরম মিলিয়ে উত্তর-পূর্ব ভারতের সাত রাজ্যের হাতছানিতে তাওয়াং যাওয়াটা ছিল অন্যরকম এক অভিজ্ঞতা।

সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ১০ হাজার ফুট উঁচুতে অরুণাচলের পর্যটনশহর তাওয়াং থেকে ভারত-চিন সীমান্তের দূরত্ব মাত্র ৪৫ কিলোমিটার। যদিও ভারতীয় সেনাবাহিনীর আপত্তির কারণে সেই সীমান্তে পৌঁছতে পারিনি, কিন্তু সীমান্তের সন্নিকটবর্তী জাংফল জলপ্রপাতের সৌন্দর্য চিন সীমান্ত না দেখার দুঃখ ভুলিয়ে দিয়েছিল। সফরসঙ্গী আশরাফুজ্জামান উজ্জ্বল জলপ্রপাতের পানিতে ভিজতে ভিজতে তথ্য দিলেন যে, এই লোকেশনেই বলিউডের জনপ্রিয় *কয়লা* ছবির সুটিং হয়েছিল। তার ঘোষণা শুনে আমরা আরেকটু বেশি সময় কাটালাম তীব্রবেগে পাহাড় থেকে নেমে আসা জলরাশির ধারে। নানা ভঙ্গিতে ছবি তোলার সুযোগও ছাড়লেন না আকতার, হেলাল আর বাপি। এসব করে যখন ক্ষুধায় পেট চোঁ চোঁ করছে, তখন মাথায় চিন্তা এল দুপুরের খাবার কোথায় পাব? কিন্তু তখনও জানা ছিল না, জলপ্রপাতের খুব কাছেই আমাদের মত ভেতো বাঙালির জন্য কি বিস্ময় অপেক্ষা করছে!

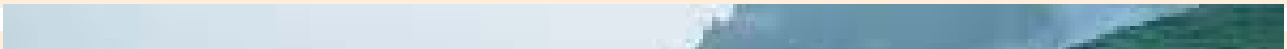

সেই বিস্ময়ের নাম লবসান রেস্টুরেন্ট। পথের পাশে একচালা ছাপড়া ঘরের খাবারের হোটেল সম্পর্কে আগেই জানতেন আমাদের ড্রাইভার। কিন্তু সেখানে যে ডালভাত দি য়ে উদরপূর্তির মহাসুযোগ পাব, সেটা ছিল কল্পনার বাইরে। সুটাম গোগইয়ের মালিকানাধীন সেই রেস্টুরেন্টে কাজ করেন অসমের চার বাঙালি। তাদেরই একজন শংকরের রান্না করা দুপুরের খাবার আমাদের ছয় বাঙালির আনন্দ বাড়িয়ে দিয়েছিল শতগুণ। সেখানে ডালভাত মি লে যাওয়ায় আমাদের বিস্ময় আর ধরে না! অরুণাচলের পাহাড়চূড়ায় তাওয়াং শহর থেকে দূরে ভাত পাওয়া ছিল হাতে চাঁদ পাওয়ার মত। তার সঙ্গে ছিল করলা, ঢেড়স ভাজি আর ঝাল মুরগির মাংসের সঙ্গে খাঁটি মসুরের ডাল। শুধু কি ভাত খাওয়া? অনেক গল্প হল অসম থেকে আসা বাঙালিদের সঙ্গে। কেউ তিন বছর কেউবা চার বছর ধ রে কাজ করছে অরুণাচলে এসে। অরুণাচলের এই ছোট্ট শহরটি শুধু যে জাংফল জলপ্রপাতের জন্য বিখ্যাত তাই নয়, এই উপত্যকায় আছে বৃহৎ বৌদ্ধ মন্দির এবং ষষ্ঠ দালাই লামার জন্মস্থান। দালাইলামা বলে অভিহিত বৌদ্ধধর্মের ধর্মীয় গুরুদের মধ্যে একমাত্র ষষ্ঠ দালাইলামা হয়েছেন তিব্বতের বাইরে থেকে। বর্তমানে চতুর্দশ দালাই লামা নেতৃত্ব দিচ্ছেন। আমরা গিয়েছিলাম সেই দালাই লামার জন্মস্থান এবং তাঁর মায়ের গ্রামেও। সে এক চমৎকার অভিজ্ঞতা।

যদিও আমরা ভারত সরকারের পর্যটন মন্ত্রণালয়ের আয়োজনে অরুণাচল আর নাগাল্যান্ডে গিয়েছিলাম কিন্তু সেই পর্যটনের বাইরে উত্তরপূর্ব ভারতের উন্নয়নটাও চোখে পড়েছিল একটু অন্যভাবে। ভারত সরকার বেশ আগ্রাসীভাবেই তাদের উত্তরপূর্ব ভারতের পিছিয়ে পড়া রাজ্যগুলোর উন্নয়নে ব্রতী হয়েছে। গত বছর অসমের গৌহাটিতে এবং এবছর অরুণাচলের তাওয়াংয়ে টুরিজম মার্টের আয়োজন সেই উদ্যোগেরই অংশ। টুরিজম মার্টের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের পর্যটন সচিব পারভেজ দেওয়ান জানান, তাঁদের প্রতিটি মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শতকরা ১০ ভাগ এখন খরচ হচ্ছে উত্তর-পূর্বের উন্নয়নে। ভারতের উত্তরপূ র্বের সাত রাজ্য, যাকে আমরা সেভেন সিস্টার্স বলি, তার বেশিরভাগই বাংলাদেশের সঙ্গে স্থলসীমান্তে সংযুক্ত। অসম, মেঘালয়, ত্রিপুরা ও মিজোরামের সঙ্গে বাংলাদেশের সরাসরি স্থলপথ আছে। এর বাইরে মণিপুর, নাগাল্যান্ড ও অরুণাচলে ভারতের অনেক রাজ্যের চেয়ে বাংলাদেশ থেকে সড়কপথে যাওয়া অনেকটাই সহজ। সিলেট পেরিয়ে মেঘালয়ের শিলং পৌঁছলে সেখান থেকে সড়কপথে এই তিনটি রাজ্যে ঘুরে আসা যায় অনায়াসে। সেভেন সিস্টার্সের সঙ্গে সিকিম ও পশ্চিমবঙ্গকে যুক্ত করে তাওয়াং মার্টকে একটি ভিন্নধর্মী মেলায় রূপ দিতে চেষ্টা করে ভারত সরকারের পর্যটন মন্ত্রণালয়। সিকিম ও পশ্চিমবঙ্গসহ ভারতের নয়টি রাজ্যের পর্যটন বিভাগের পরিবেশনায় এসব জায়গায় কি কি দেখবার আর বেড়ানোর জায়গা আছে, সে সম্পর্কে জানা গেল। মণিপুরীরা যেমন তুলে ধরেন তাঁদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের রূপ, তেমনি অসম তুলে ধরে তাদের কাজিরাঙ্গা ফরেস্ট আর ঐতিহাসিক কামরূপ কামাক্ষ্যা মন্দিরের কথা। ঐতিহ্যবাহী নাগাযোদ্ধাদের কথা পর্যটন কর্মকর্তার কাছে যা শুনেছি তার চেয়েও হাজারগুণ বেশি উপভোগ করেছি নাগাল্যান্ডের ডিমাপুর আর কোহিমা ভ্রমণ। ডিমাপুর বাজারেও পেয়েছিলাম কয়েকজন বাঙালির সন্ধান যাদের পূর্বপুরুষের বাড়ি ছিল কুমিলায়। এরা ডিমাপুর বাজারে নাগামরিচ বিক্রি করে– স্থানীয়ভাবে যাকে বলা হয় 'রাজা মির্চা'। ডিমাপুর বাজারে আমরা স্কচ নামে একটি সবজির সঙ্গে পরিচিত হই। অনেকটা পেঁপের মত দেখতে সেই সবজির তরকারি খেয়েছিলাম কোহিমার উপান্তের সবুজ গ্রাম খোনমায়। শিকারের জন্য বিখ্যাত খোনমা গ্রামের পাহাড়ের ঢালের খাঁজে খাঁজে এখন হয় নানা জাতের ধান আর গ্রামের প্রায় প্রতিটি বাড়ির সামনেই আছে ফুলের সমারোহ। দুই তরুণীর হাতে রান্না করা স্থানীয় ধানের ভাত খেয়েছিলাম যা আমাদের আউশের লালচালের ভাতের মত।

সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় দশ হাজার মিটার উঁচু তাওয়াং ভ্যালির তিনদিনের ভ্রমণউৎসবে ভারতের আটটি প্রদেশের প্রতিনিধিদের সঙ্গে ভারতের বাইরের ২৩টি দেশের ৬৮ জন প্রতিনিধি যোগ দিয়েছিলেন। আলোচনার কেন্দ্রে ছিল সেভেন সিস্টার্সের পর্যটন সম্ভাবনা সম্পর্কে বহির্বিশ্বের দৃষ্টি আর্কষণ করা। ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার তীব্র শীত উপেক্ষা করা গেছে ভারতের পর্যটন মন্ত্রণালয়ের উষ্ণ আতিথেয়তায়, সঙ্গে পর্বত আর মেঘমালার সৌন্দর্য উপভোগ, ষষ্ঠ দালাই লামার জন্মস্থান এবং তাওয়াং বৌদ্ধ মন্দির দেখাটাও কম আর্কষণীয় ছিল না বিদেশীদের জন্য। সবাই মিলে যখন হাজির হলাম বলিউডের *কয়লা* ছবিতে দেখা বিখ্যাত সেই জাং ওয়াটারফলে, সবার আনন্দ দেখে কে! তবে সতর্ক ছিলেন আয়োজকরা, তাই টুরিজম মার্টের আনুষ্ঠানিক নৈশভোজে হাজির করেছিলেন বলিউড তারকা বিবেক ওবেরয়কে। এক মঞ্চে নাচার সময় পাশে পেলাম অরুণাচলের মুখ্যমন্ত্রী নাবাম টুকিকে। মাইকে ঘোষণা এল একই মঞ্চে আছেন বিবেক ওবেরয়, হায় ছবি তোলার

আগেই তিনি নেমে গেলেন নিরাপত্তা বলয়ে।

পর্যটন শিল্পে অনেকটাই এগিয়ে থাকা ভারত এখন বিদেশী পর্যটকদের তাদের সেভেন সিস্টার্সে পাঠাতে চাইছে 'হিডেন প্যারাডাইস এন্ড আনএক্সপোরড্ হ্যাভেন'এর স ন্ধানে। সেজন্য টুরিজম মার্টের আয়োজন তাওয়াংয়ের পাহাড়ে– যেখানে বরফে সেলুলার ফোনের টাওয়ার ঢেকে যায়। অসমের গৌহাটি থেকে সড়কপথে দু'রাতদু 'দিন লাগলেও আমাদের নিয়ে যাওয়া হল হেলিকপ্টারে। ফড়িঙের মত চপারযোগে এক ঘণ্টায় ভুটানের ওপর দিয়ে আমাদের তাওয়াং নিয়ে গেলেন পাইলট কর্নেল (অবঃ) রণবীর রায়।

তাওয়াংয়ে ভারতের পর্যটন সচিবের একটি সাক্ষাৎকার নিয়েছিলাম দুপুরের খাবারের ফাঁকে। পাহাড়ে এসেছেন বলে তাঁর পরনে আদিবাসীদের পোশাক। জানালেন উত্তরপূ র্বের সাতটি রাজ্যে সব রকমের রাজনৈতিক অস্থিরতা দূর হয়েছে বলেই এখন এই অঞ্চলের পর্যটনে জোর দিচ্ছে ভারত সরকার। সেকার ণেই দেখলাম গৌহাটি থেকে চার-লেনের রাস্তা হচ্ছে মেঘালয়, মিজোরাম এবং মণিপুরের দিকে। আরো জেনেছি, এই সড়কপথ ভারত সরকার নিয়ে যেতে চায় মিয়ানমার পর্যন্ত। তিনি আরও জানালেন, অরুণাচলের অন্তর্ভুক্ত চিন-সীমান্ত পাহারা দিতে সড়কঅবকাঠা মো জোরদার করা দরকার।

পর্যটন সচিবের সঙ্গে আনুষ্ঠানিক সাক্ষাৎকার ছাড়াও তাওয়াংয়ে কথা হয় পর্যটন পরিচালক মমতা কোর্চির সঙ্গে। বাংলাদেশের পর্যটনমন্ত্রীর সঙ্গে পরিচয় আছে জেনে পারভেজ অনুরোধ জানালেন, আমি যেন মন্ত্রীকে অসম-বেঙ্গল রিভারাইন টুর সম্পর্কে অবহিত করি। বাংলাদেশের মানুষ যেন অসম, মেঘালয়, ত্রিপুরা ছাড়াও নাগাল্যান্ড, মণিপুর, মিজোরাম ও অরুণাচলে আসেন সেজন্যই পর্যটন মেলায় সাংবাদিকদের আমন্ত্রণ। আমার ব্যক্তিগত অভিমত অবশ্য শুধু পর্যটন নয়, সাত রাজ্যের উন্নয়নকাজে বাংলাদেশের পণ্য বিশেষ করে সিমেন্ট-রডসহ অন্যান্য নির্মাণসামগ্রী ব্যবহারের সুযোগ পাওয়া গেলে অর্থনৈতিকভাবে আমরা লাভবান হতে পারি। আর এই সাত রাজ্য শিল্পে তেমন উন্নত না হওয়ায় অনেক দূর থেকে নির্মাণসামগ্রী নেওয়ার ক্ষেত্রে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের খরচ ও হয়রানি দুইই বা ড়ে। সিলেটের তামাবিল পার হলে দুই ঘণ্টায় মেঘালয়ের রাজধানী শিলং পৌঁছনো যায়। আর সেখান থেকে তিন ঘণ্টা পাড়ি দিলে উত্তরপূ র্বের গেটওয়ে অসমের গৌহাটি।

প্রণব সাহা এডিটর আউটপুট, এটিএন নিউজ

উৎপল দত্ত

ঘটনাপঞ্জি ❖ মার্চ

০১ মার্চ ১৯৩৪ ❖ অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম
০২ মার্চ ১৯৪৯ ❖ সরোজিনী নাইডুর মৃত্যু
০৫ মার্চ ১৯৩৯ ❖ দিব্যেন্দু পালিতের জন্ম
১২ মার্চ ১৯৮৮ ❖ সমরেশ বসুর মৃত্যু
১৩ মার্চ ১৯১৫ ❖ প্রতিভা বসুর জন্ম ঢাকার হাঁসাড়া গ্রামে
১৫ মার্চ ১৯০৪ ❖ অন্নদাশঙ্কর রায়ের জন্ম ওড়িশার ঢেঙ্কানালে
১৬ মার্চ ১৮৮০ ❖ সাহিত্যিক রাজশেখর বসুর জন্ম
১৮ মার্চ ১৯১২ ❖ বিমল মিত্রের জন্ম
২২ মার্চ ১৮৯৪ ❖ মাস্টারদা সূর্য সেনের জন্ম
২৩ মার্চ ১৯০২ ❖ সাহিত্যিক জরাসন্ধ (চারুচন্দ্র চক্রবর্তী)র জন্ম
২৫ মার্চ ১৯৩৩ ❖ শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের জন্ম
২৯ মার্চ ১৯২৯ ❖ উৎপল দত্তের জন্ম
৩০ মার্চ ১৬১৫ ❖ শাহ্জাহানতনয় দারাশিকোহ্র জন্ম
৩০ মার্চ ১৮৯৯ ❖ শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম

happy 2014 Coca-Cola

'Coca-Cola', 'Coke', the 'Contour Bottle' and the 'Dynamic Ribbon' are the registered trademarks of The Coca-Cola Company. 'Coca-Cola' contains no fruit. 'Coca-Cola' contains added flavours.

ধারাবাহিক উপন্যাস

নিঃসঙ্গ মানুষের কলমুখর সময়

সেলিনা হোসেন

(পূর্ব প্রকাশিত-র পর)

বকুলকে প্রশ্নটি করার পরই বাবলার কথা মনে পড়ে শিউলির। ভেতরটা খচ করে ওঠে। ও আবার বকুলকে প্রশ্ন করে, কি হয়েছে?

কি আবার হবে। মন ভাল নেই।

দেখে মনে হয় না যে মন ভাল নেই।

এমন সন্দেহ করার অভ্যাস তো তোমার ছিল না বুবু।

শিউলি ওর প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে উঠোনের চারদিকে তাকায়। উঠোনের মাটিতে অন্য একটি পায়ের ছাপ মনে হয় । কিন্তু ঠিক স্পষ্ট নয়। এ নিয়ে বকুলকে প্রশ্ন করে লাভ নেই। উচিত হবে না। পাশাপাশি নিজের মনের মধ্যে একটি প্রশ্ন স্থির হয়ে যায়– এ বাড়ির বাতাসে আজ সম্পর্কের বাতাস বইছে। একটা কিছু ঘটেছে। শিউলি ভাবতে থাকে যে বকুলের সঙ্গে কারো প্রেমের সম্পর্ক হয়েছে এবং ছেলেটি এই বাড়িতে এসেছিল। যে কারণে বাবলা ওর মনের মধ্যে ছায়া হয়ে দাঁড়িয়েছে। অস্পষ্ট নয়, স্পষ্ট ছায়া। ওর হাতের বই-খাতা, ছাতা, ভ্যানিটি ব্যাগ ধুপ করে পড়ে যায়।

কি হল বুবু?

মনে হচ্ছে বাড়িতে কেউ এসেছিল।

যত্তসব, বাজে সন্দেহ। বাবার কাছে নালিশ দেব। বলব, বাজান আপনার বড় মেয়ের বিয়ে দেন। ওর মাথায় গোলমাল হচ্ছে।

পড়ে যাওয়া জিনিসগুলো তুলতে তুলতে কথা বলছে দেখে শিউলির আর বকুলের মুখ দেখা হয় না। বুক ফুঁড়ে দীর্ঘশ্বাস আসে। বকুল সবকিছু হাতে নিয়ে বলে, চল, ঘরে চল। শিউলির মনে হয় বকুল নয় বাবলাই দাঁড়িয়ে আছে। ও ঘরের দিকে পা বাড়াতে পারে না। হাতমুখ ধোয়ার জন্য পেছনে যায়। বালতির পানিতে হাত ডোবানোর সঙ্গে সঙ্গে ওর ভীষণ কান্না পায়। ও দু'হাতে পানি নিয়ে নিজের চোখ ধুয়ে ফেলে। পেছন থেকে বকুল বলে, এখন আর কেঁদে লাভ হবে না। যা ভুল করেছ তো করেছই। চল, ঘরে চল।

তুই যা।

তোমাকে না নিয়ে যাব না।

এই বাড়িতে আজ একটা কিছু ঘটেছে।

তোমার মাথা ঘটেছে। বুবু তুমি খুব সন্দেহবাতিক হয়েছ। তোমার মনের মধ্যে কিছু একটা ঘটেছে তাই বল, বাবলা ভাইয়ের কথা মনে হচ্ছে।

কি বললি?

শিউলি ক্রুদ্ধ চোখে ঘুরে দাঁড়ায়। বকুল হকচকিয়ে ভয় পেয়ে যায়। দু'পা পিছিয়ে বলে, ঘরে চল। যা বলেছি আর বলব না।

তুই যা বকুল। আমি এখন ঘরে যাব না।

তবে কি করবে? বসে বসে পানি ঘাঁটবে?

হ্যাঁ, তাই করব।

তাহলে তাই কর। আমি গেলাম। তোমার খিদে পায়নি?

শিউলি ওর প্রশ্নের উত্তর দেয় না। ও পানিভরা বালতির দিকে তাকায়। দু'আঁজলা পানি উঠিয়ে মুখে দেয়। ভাবে, বেশ লাগছে। ও বারবার দু'হাতে মুখে পানি দেয়। কতকাল যেন এভাবে মুখ-ধোওয়া হয়নি। আশ্চর্য, কোন কোন সময় বুঝি এমনই। অন্যরকম হয়ে যেতে বলে না, কিন্তু করে দেয়। নিজেকে না বোঝার বাইরে নিয়ে যায়। বড় জটিল এই বেঁচে থাকা! কতদিন টানতে পারবে এই জীবন! বুড়ি থুত্থুড়ি হয়ে একদিন ঘরের ভেতরে মরে পড়ে থাকবে। দেখার কেউ থাকবে না। এমন যদি হয় তিন দিন বা পাঁচ দিন কেউ খোঁজ করল না? কি হবে তখন? পিঁপড়েয় ভরে যাবে মৃত শরীর? শিউরে ওঠে শিউলি। ভাবে, এখনই এসব ভাবার দরকার নেই। ওর নিজের কেউ না থাকলে কি হবে, আশেপাশের লোকজন থাকবে না? দূর সম্পর্কের কাউকে এনে কাছে রাখা যাবে না? মামার বাড়ি, চাচার বাড়ির কেউ? কিংবা বোনদের ছেলেমেয়েরা? শিউলি বালতির পানিতে নিজের চেহারা দেখার চেষ্টা করে। হয় না। ওর হাতের ছোঁয়ায় বালতির পানি স্থির নয়। দোলায়মান পানিতে ছায়ার রেখা স্পষ্ট হয় না। শিউলি শাড়ির আঁচলে মুখ মোছে। একইসঙ্গে টের পায় পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে কেউ। পায়ের শব্দ নিঃশব্দ হলে সেটা পানির আলোড়নে মিশে যায়। দুইয়ে মিলে এক হয়ে প্রবল কষ্ট দেয় শিউলিকে। ও দু'হাতে মুখ ঢাকে।

পেছন থেকে তিন বোন ওর গলা জড়িয়ে ধরে পাশে বসে পড়ে। ওর মনে হয় চারদিক থেকে কেউ বলছে, ভয় পেয়ো না। আমরা তোমার সঙ্গে আছি। তোমার কেউ নেই কে বলেছে, আমরা তো আছি। অন্য কোথাও থাকলেও ফিরে ফিরে তোমার কাছে আসব। আমাদের জীবনে শ্বশুরবাড়ি মধুর হাঁড়ি কি হবে যে, আমরা বাজানের বাড়ি আসতে পারব না মায়ের মত বড় বোনকে দেখতে?

পাশ থেকে পদ্ম বলে, আমরা ঠিক করেছি আমরাও তোমার মত সারারাত বসে থাকব!

কেন? তোদের দুঃখ কি?

তোমার দুঃখ কি শিউলি বুবু?

আমার কোন দুঃখ নাই।

তাহলে এখানে বসে আছ কেন?

ইচ্ছা হয়েছে, মজা পাচ্ছি তাই।

ও এটা তোমার ফুর্তি? তাই বল। তাহলে তোমার সঙ্গে বসে থাকা আমাদেরও ফুর্তি।

শিউলি দাঁতমুখ খিঁচিয়ে বলে, আমাকে তোরা বিরক্ত করবি না বলে দিলাম।

তুমি বললেই হল নাকি, একশোবার করব।

একদিন দেখবি এই বাড়িতে আমি একলা মরে পড়ে আছি। শকুন ঠুকরে খাবে, পরে শেয়াল-কুকুরে লাশ টেনে নিয়ে গর্তে ফেলে খাবে। কঙ্কালটা–

চুপ কর। পদ্মর হাত এক বড় মানুষের থাবার মত শিউলির মুখ চাপা দেয়। কঠোর স্বরে বলে, আর একটা কথা বলবিতো–

শিউলি ওকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেয়। এক ঝটকায় পদ্মর হাত আছড়িয়ে বলে, এই বাড়িতে আজ বাইরের ছেলের গন্ধ পেয়েছি। তোরা সবাই আমাকে ছেড়ে যাওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছিস।

বকুল দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে চিৎকার করে বলে, আমরা তো যাবই। যাব না কেন? আমরা কি সবাই তোমার মত আইবুড়ো হব? বল তুমি কি চাও?

আমি চাইলেই কি তোরা শোনার জন্য বসে থাকবি?

আকস্মিকভাবে স্তব্ধ হয়ে যায় পরিবেশ। মুহূর্ত মাত্র। শিউলির কণ্ঠ আবার ঝাঁঝিয়ে ওঠে, কি সবাই চুপ কেন?

বকুল বলে, আমরা আইবুড়ো হব না।

চম্পার গলা ধরে যায়। কাঁদকাঁদ স্বরে বলে, আমি সংসার না করে থাকতে পারব না।

পদ্মর স্বর তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে, আমিও ঘর চাই। পুরুষ মানুষ চাই। তোমাকেও চাই। যেখানে থাকি তোমার কথা মনে করব।

পদ্ম ঠিকই বলেছে। আমরা সবাই তোমাকে মধ্যমণি করে রাখব।

বকুল সরাসরি শিউলির দিকে তাকিয়ে বলে, আমি চাই তুমিও বিয়ে করবে। তোমার একা থাকা চলবে না।

শিউলি দু'হাতে মুখ ঢাকে। ওদের দিকে তাকাতে পারে না। ওর ভয় করে। ও ভয়ে কুঁকড়ে যায়। তারপর সোজা হয়ে বসে বালতিটা উল্টে ফেলে দিয়ে বলে, আমি সারাজীবন একাই থাকব। মাস্টারি করে জীবন শেষ করব।

তুমি আমাদের চাও না?

চাইব না কেন? চাই। তোরা শ্বশুরবাড়িতে থাকবি আর আমার এখানে আসা-যাওয়া করবি।

এইতো বেশ ভালমানুষীর মত কথা বললে। চল, আজ খিচুড়ি আর ডিমভাজি হবে।

শিউলি চোখ বড় করে বলে, বাজান আর হাস্নু কি হল? আসে না কেন?

আসবে, আসবে– ভাবার কিছু নাই। মা বোধহয় বাড়িতে নাই। সেজন্য হাস্নু বসে আছে।

মা আবার কোথায় যাবে?

কেন মায়ের ধাত্রীর কাজ আছে না? গাঁয়ের কোন বাড়িতে হয়তো কারো প্রসব বেদনা উঠেছে। মা গেছে ফ্রি ধাত্রীগিরি করতে।

হি-হি করে হাসে বকুল। ওর হাসিতে গা জ্বলে ওঠে শিউলির। ধমকের সুরে বলে, এটা কোন হাসির কথা না। যত্তসব ফাজলামি।

শিউলির ধমকের কণ্ঠস্বর উপেক্ষা করে বকুল আরেকদিকে তাকিয়ে বলে, আমি চাই আমার প্রথম সন্তান মায়ের হাতে হোক। মা

তার চাঁদমুখো নাতির দিকে তাকিয়ে বলবে, আলাই বালাই চলে যা। নাতির চোখে চাঁদের–

কথা শেষ না করে বকুল একছুটে বাড়ির উঠোনে চলে যায়। ওর পেছনে পেছনে চম্পা আর পদ্মও দৌড় দেয়। দাঁড়িয়ে থাকে শিউলি। ভাবে, বকুলের কাছে আজ পুরুষ এসেছিল। কে? আকাশ-পাতাল হাতড়িয়ে নাম খোঁজে ও। কারো চেহারা সামনে আসে না। বকুল সংসারের স্বপ্ন দেখছে, এমন কি সন্তানেরও। কাউকে না পেলে কি এমন স্বপ্ন দেখা যায়? আজ বকুলের কাছে কেউ এসেছিল, এমন একটি স্থির বিশ্বাস ওর মধ্যে জন্মায়।

তিন.

শেষ বিকেলে ফিরে আসে জয়নুল মিয়া আর হাস্নুহেনা। দু'জনের চোখেমুখে ক্লান্তির ছাপ শুধু নয়, তারা যেন এক বিধ্বস্ত মানুষ। শরীরের কতটা ছিঁড়েখুঁড়ে ফেলে এসেছে কোথায়, তার কিছুই জানে না। বাকিটা থেকেও একটু একটু করে ঝরছে রক্ত। ফোঁটা ফোঁটা রক্ত ফেলে হেঁটে এসেছে এতটা পথ। জয়নুল হাতে পুঁটলি রাখারও সুযোগ পায় না– সেটা হাত থেকে পড়ে যায়। নিজে বারান্দায় বিছানা-মাদুরের ওপর বসে পড়ে। তারপর লম্বা হয়ে শুয়ে বুকের ওপর হাত জড়ো করে রাখে। চোখ বোঁজা। বড় বড় নিঃশ্বাসে বুকের পাঁজর ওঠানামা করে। চার মেয়ে ঘিরে ধরেছে তাকে। হাস্নুহেনা কারও সঙ্গে কথা না বলে কলতলায় গিয়েছে। চোখেমুখে পানি দিচ্ছে।

ভাবছে, গোটা শরীর পানিতে ভেজালেও জ্বালা জুড়াবে না। বুকের ভেতর দাউদাউ আগুন। একটু পরে ও অর্ধেক ভেজা কাপড় নিয়ে বারান্দায় এসে বসে। খানিকটা দূরে নিজের পিঁড়িটার ওপর। ওদের পাঁচ বোনের পাঁচটা পিঁড়ি আছে। বাজানেরও একটা আছে। দাদীর আর মায়েরও ছিল। সেগুলো এখন মাচার ওপর ওঠানো আছে। চার বোন এখন পর্যন্ত বাবাকে প্রশ্ন করেনি। তাকে শান্ত হতে দিয়েছে। দম নিতে দিয়েছে। দেখতে পায় বাজানের বড় বড় শ্বাস কমে এসেছে।

শিউলি জিজ্ঞেস করে, বাজান পানি খাবেন?

জয়নুল মিয়া চোখ না খুলেই বলে, দাও মা।

পদ্ম দৌড়ে রান্নাঘরে যায়। জগে করে পানি আনে। ভাবে, বাজানের অনেক পিপাসা পেয়েছে। এক গ্লাস পানিতে হবে না। পদ্মর আশঙ্কা সত্য করে জয়নুল মিয়া তিন-চার গ্লাস পানি খেয়ে বারান্দা থেকে নেমে উঠোন পেরিয়ে কলতলায় যায়। আজ তার জীবনে সেই দিনটিই ফিরে এসেছে। এখন থেকে পনেরো বছর আগে সে তার সংসারে একটি বজ্রপাত ঘটিয়েছিল। সেই একই বজ্রপাত তাকে আজ আবার কাবু করে ফেলেছে। বারবারই মনে হচ্ছে, দিন ফুরানোর আগের অবস্থা। জয়নুল মিয়া এক বালতি পানি সামনে নিয়ে নিশ্চুপ বসে থাকে। নিজের চেহারা দেখার চেষ্টা করে। দেখা হয় না। পানিতে গাছের ছায়া পড়ে কালো হয়ে গেছে। পরক্ষণে ভাবে, কোনদিন আর নিজের চেহারা আয়নায়ও দেখবে না। যে মানুষের কর্মের দায় মাথার ওপর বোঝা হয়ে থাকে সে মানুষের চেহারা নিজের দেখা উচিত নয়। এমন একটি সিদ্ধান্তে আসার সঙ্গে সঙ্গে শরীর মুচড়ে ওঠে। জয়নুল মিয়ার মনে হয় বুকে ব্যথা হচ্ছে। দু'হাতে বুক চেপে ধরলে মাথা বালতির ওপর ঝুঁকে যায়। জয়নুল মিয়া জ্ঞান হারায়।

বারান্দায় চার বোন গালে হাত দিয়ে বসে আছে। হাস্নুহেনা কাপড় বদলাবে বলে ঘরের দরজা বন্ধ করেছে। দরজা খোলেনি। ওরই বা এত সময় লাগছে কেন? মামার বাড়িতে আজকে কি হল? চার বোন পরস্পরের দিকে তাকায়। ভুরু কুঁচকায়, চোখ বড় করে, উথালপাতাল ভাবনায় ডুবে যায়– কিন্তু সমাধান ওদের কাছে নেই। ওরা অপেক্ষা করছে। অপেক্ষার সময় ক্রমাগত দীর্ঘ হয়। একসময় পদ্ম উঠে গিয়ে ঘরের দরজায় শব্দ করে।

হাস্নু বুবু দরজা খোল। আমরা তো মরে যাচ্ছি।

হাস্নুহেনা দরজা খুলে ঝাঁঝের সঙ্গে বলে, মরণ কি এত সোজা। মরণের জন্যও সওয়াব লাগে। ভাগ্য, ভাগ্য–

তুমি বারান্দায় আসো। আমরা মায়ের কথা শুনব। মায়ের কি হয়েছে?

মায়ের কিছু হয়নি। মা তো শুধু আমাদের মা না। মা তো একজন ধাত্রী-মা।

জানি তো। তার কি হয়েছে? তারজন্য তোমরা মেজাজ খারাপ করছ কেন?

মায়ের হাতে একটি মেয়েশিশুর জন্ম হয়েছে।

তাতে হয়েছে কি? মাতো কত প্রসব করায়। এটাতো মার কাছে ডালভাত।

থাম, ছেড়ি থাম। শুয়োর একটা, হারামি।

চার বোন অবাক হয়ে হাস্নুহেনার দিকে তাকিয়ে থাকে। ভাবে, কোন বড় ধরনের ঘটনা ঘটেছে যেটার সঙ্গে ওদের পাঁচবোনের সম্পর্ক আছে। নইলে হাস্নুহেনা এমন করত না। ওদের বাজানও চুপসে আছে। কথা না বলে উঠোনে নেমে গেছে। হয়তো গোসল করছে। চারজন চুপ করে বসে থাকে। কিছুই ভাল লাগে না। কেমন করে যে জীবনটা কেমন হয়ে গেল ওদের। কতকিছু পাওয়ার কথা ছিল, তার একভাগও পাওয়া হল না। হাস্নুহেনা তখনও ফোঁস ফোঁস করছে আর চোখ মুছছে।

শিউলি ভাবে, মা এখন কি করছে? ধাত্রীর ফার্স্টএডবক্সটি পরিষ্কার করে রাখছে কি? নাকি গালে হাত দিয়ে বসে আছে? ভাবছে, কালো রঙের কাকগুলো যদি সব সাদা হয়ে যেত, তাহলে কেমন হত? যাহ্, মা কি এখনও শিশু নাকি? আচ্ছা, তার জন্মের সময় নানা কি মন খারাপ করেছিল? নাকি বলেছিল মেয়ে আমার সোনার খনি? শিউলি এটুকু ভেবে অন্যদের মুখের দিকে তাকায়। বুঝতে পারে, সব বোনের ভাবনায় এখন ওদের মা। ওদের মা ওর বুকের ভেতর ঢুকেছে কালো কাকের বদলে সাদা কাক হয়ে।

বকুল ভাবে, মা এখন কি করছে? বাড়ির আশেপাশে বা কাছেধারে কোথাও কি আর একটি প্রসব করাতে গিয়েছে? ব্যথা উঠেছে সেই নারীর। মা জানে না ছেলে হবে না মেয়ে হবে। যে নারীর ব্যথা উঠেছে সে কঁকাচ্ছে, ব্যথায় কেঁদে ফেলছে। আর মা অধীর আগ্রহে বসে আছে। অপেক্ষা করছে বাচ্চাটির নাড়ি কাটবে বলে। কিন্তু এখনওতো বাচ্চার মাথাই দেখা যায় না। ও কি পৃথিবীতে আসতে চায় না? হয়তো ভাবছে, পৃথিবীতে না যাওয়াই ভাল। মায়ের মন খারাপ হয়। ভাবে, পাঁচটি মেয়ে সন্তানের জন্ম দিয়ে সংসারের আলো তার জীবন থেকে মুছে গেছে। মা হয়তো ভাবছে, আরেক জীবনে কোন বড় পাপ করেছিল। সেইজন্য এই শাস্তি। এখন ওদের মা ওর বুকের ভেতর ঢুকেছে কালো ভোমরা হয়ে।

চাঁপা ভাবে, মা এখন কি করছে? নিশ্চয়ই কোথাও একটি বাচ্চা হয়েছে আর মা ওর শরীর মুছে দিচ্ছে কালো ন্যাকড়া দিয়ে। পুরনো কোন শাড়ির ন্যাকড়া। কালো বলে সেই ন্যাকড়ার রক্ত দেখা যায় না। মায়ের হাতে একটি ছেলের জন্ম হয়েছে। মা এ পর্যন্ত কতগুলো ছেলের জন্ম দিয়েছে? ছেলের নাড়ি কাটতে মায়ের কেমন লাগে? চাঁপার ভেতরটা ধড়ফড় করে ওঠে। মাতো ধাত্রী-মা। তার কাছে আবার ছেলে আর মেয়ে কি! ওদের

এক একটি মুখ যেন এক একটি পাথর খণ্ড। হাজার বছরের পুরনো কালো কুচকুচে পাথর। ওই পাথর খণ্ডের উপর শ্যাওলা জমেছে। এই শ্যাওলায় ঢেকে গেছে চোখ-নাক-ভুরু-কপাল। হাস্নুহেনার মনে হয় বোনেরা পাথর হয়ে গেলেও ওর কিছু করার আছে। ও গল্প বলে, বুলির বাপ হরকত আর মা হাসমতআরা। দু'জনের প্রেমের বিয়া– দু'জনে দিন-মজুরি খাটে। দিন আনে দিন খায়। হাসমত ধান ভেনে খুদকুঁড়ো জোগায়, হরকত হাটে কুলিগিরি করে।

কাছে যেমন সব পাখি সমান, পাখিদের ছেলে-মেয়ে নাই। তেমনি ওর মায়ের কাছে সব বাচ্চা সমান। এখন ওদের মা ওর বুকের ভেতর ঢুকেছে একটা লক্ষ্মী প্যাঁচা হয়ে।

পদ্ম ভাবে, মা এখন কি করছে? কোথাও না গিয়ে নিশ্চয় বাড়িতে আছে। সুফির বাচ্চা হবে। সুফি ওদের মামাতো বোন। সেই বাচ্চার জন্য মা নিশ্চয় কাঁথা সেলাই করছে। লাল-নীল-সবুজ-হলুদ-কালো-বেগুনী-খয়রি রঙের সুতো কাঁথার ওপর সুতোর ফুল ফুটে উঠছে। গাছ-লতাপাতা থাকছে। পাখি থাকছে। বাচ্চার মুখও থাকছে। দোলনা থাকছে। ঝুনঝুনি থাকছে। হা-হা মায়ের ভালবাসা আমার বুকের ভেতর নদী হয়েছে। সেই নদীর সোনালি মাছ আমার মা। মায়ের বুকে এখন নদীর স্রোত বইছে। সেই নদীর ডিঙিতে তার পাঁচ মেয়ে আছে।

তখন হাস্নুহেনা চোখ মুছে বোনদের মুখের দিকে তাকায়। ফিক করে হেসে বলে, তোমরা মায়ের কথা ভাবছ না?

ভাবছি তো। তুই ভাবিস না?

ভাবি তো। তোমাদের মত আমিও ভাবি।

আমরা আমাদের বুকের ভেতর মায়ের ছবি বানিয়েছি। তুইও কি বানিয়েছিস?

হ্যাঁ, বানিয়েছি।

চার বোন একসঙ্গে কলকলিয়ে উঠে বলে, তাহলে বল তুই কি বানিয়েছিস?

আমি ভাবলাম, মা এখন কি করছে? নিশ্চয় একটি বড় মাঠে মা ফুলগাছের বীজ বুনছে। মাঠটা একদম পৃথিবীসমান বড়। পৃথিবীর পাঁচটা কোণা। এক কোণায় বুনেছে শিউলি ফুলের বীজ। আর এক কোণায় বকুল। এক কোণায় হাস্নুহেনা। এক কোণায় চাঁপা। আর এক কোণায় দীঘি বানিয়ে সেখানে দিয়েছে পদ্মর চারা। বীজ বুনে মা বসেছিল। দিন গড়াল। মায়ের লাগানো চারা বড় হল। ফুলে ফুলে ভরে গেল গাছগুলো। একসাজি ফুল মায়ের বুকের ভেতর রয়ে গেল। ফুলের গন্ধে মা পাগল হয়ে আছে। যত শ্বাস টানে তত ফুলের গন্ধে বুক ভরে যায়। আমার মা রানীর মত বসে থাকে আর মিটিমিটি হাসে।

ঠিকই বলেছিস।

আমাদের মা রানী।

ধাত্রী-রানী। হুররে–

আমাদের রানী-মা আজকে রাগ করেছে কেন।

হাস্নুহেনা থেমে থেমে বলে, ছয় মাস আগে মায়ের হাতে একটি মেয়ের জন্ম হয়েছিল। মা ওর নাম রেখেছিল বুলি। মা বলল, খুব ফুটফুটে একটি মেয়ে ছিল।

হাস্নুহেনা থামলে পদ্ম উদ্‌গ্রীব কণ্ঠে বলে, ওর কি হয়েছে? মরে গেছে?

মরে যায়নি। এইটুকু মেয়ে নিজে নিজে মরতে পারে না।

তাহলে মায়ের রাগ হয়েছে কেন?

ওকে মেরে ফেলার চেষ্টা করা হয়েছে।

কেন? ও মেয়ে বলে?

হাস্নুহেনা চিৎকার করে বলে, হ্যাঁ তাই। ও মেয়ে বলে, মেয়ে বলে– হাউমাউ করে কেঁদে ওঠে ও। দু'হাতে মুখ ঢাকে। একসময় মুখ থেকে হাত সরিয়ে বলে, আমি মায়ের সঙ্গে মেয়েটিকে দেখতে গিয়েছিলাম।

বেঁচে আছে?

আছে। মা ওকে হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করেছে। আমি যখন মায়ের কাছে যাই তখনই বাড়িতে খবরটা আসে। মা আমার হাত ধরে বলল, চল। দেখলাম মায়ের চোখে রাগ। রাগে চোখের জেলা চকচক করে।

গিয়ে কি দেখলি?

দেখলাম বাড়িতে লোকজনের ভিড়। মা চিলায়ে কাঁদে, মাটিতে গড়াগড়ি দেয়। মেয়েটাকে ওর নানি কোলে নিয়ে উঠানে দৌড়ায়। আর বুলি বুলবুলি পাখি হয়ে ওড়ে।

হিহি করে হাসে হাস্নুহেনা। সবাই বুঝতে পারে যে এটা কোন হাসি না। এটা পেত্নীর হাসি। অন্ধকার রাতের ঘোর কৃষ্ণ হাসি। আকস্মিকভাবে শিউলি বোনকে কষে ধমক দিয়ে বলে, বুলির কি হয়েছিল?

ওকে মেরে ফেলার চেষ্টা করা হয়েছিল।

কে? কে এই পাষ-?

হাস্নুহেনা এই প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে বলে, ওর মুখে এসিড ঢেলে দেয়া হয়েছিল।

আবার সবাই মিলে চেঁচিয়ে বলে, কে, কে এই পাষ-?

হাস্নুহেনা চোখের মণি বড় করে বলে, ওর বাপ– ওর বাপ–

ওর বাপ!

স্তব্ধ হয়ে যায় সবাই। এক একটি মুখ যেন এক একটি পাথর খণ্ড। হাজার বছরের পুরনো কালো কুচকুচে পাথর। ওই পাথর খণ্ডের উপর শ্যাওলা জমেছে। এই শ্যাওলায় ঢেকে গেছে চোখ-নাক-ভুরু-কপাল। হাস্নুহেনার মনে হয় বোনেরা পাথর হয়ে গেলেও ওর কিছু করার আছে। ও গল্প বলে, বুলির বাপ হরকত আর মা হাসমতআরা। দু'জনের প্রেমের বিয়া– দু'জনে দিন-মজুরি খাটে। দিন আনে দিন খায়। হাসমত ধান ভেনে খুদকুঁড়ো জোগায়, হরকত হাটে কুলিগিরি করে। দু'জনে কামাই করলে হবে কি বাড়িতে মাতবর হরকত। যখন তখন গায়ে হাত ওঠে। যখন তখন গোস্ত-মুরগি রান্না না করার জন্য চুলের মুঠি ধরে। হাসমতআরা কাঁদতে কাঁদতে বলে, এ কেমন প্রেম। গর্ভ হয় তার। হরকত শাসায়। বলে, পোলা চাই। মাইয়া হইলে বুঝবি। আমাদের ধাত্রী-মায়ের হাতে মাইয়া হয়। বাপ মাইয়া পয়দা করার শোধ নিছে। মেয়েটা এখন বাঁচলে হয়।

বকুল দাঁত কিড়মিড়িয়ে বলে, তাহলে এই ঘটনায় বাবা-মায়ের দেখাদেখি হয়।

দেখাদেখিতো হবেই– রাস্তাটা তো একটা। ওই পথেই মায়ের যাওয়া। আমার হাত শক্ত করে ধরে মা হনহন করে হেঁটে যায়। বাজানের দিকে ঘুরেও দেখে না। বাজান তো সেই বটগাছের নিচে বসে ছিল। আমি একটু দাঁড়াতে চাইলে মা আমার হাত ধরে জোরে টান দেয়। আমি আর কিছু বলি না। ঘটনার জায়গা থেকে ফেরার সময় মা নিজেই বাজানের সামনে গিয়ে দাঁড়ায়।

হাস্নুহেনা থামলে পাথরের খণ্ডরা নড়াচড়া করে ওঠে। মুখে কথা নেই। পরস্পরের দিকে তাকায়ও না। কেউ কারো মুখ দেখবে না এমন একটা ভাব সবার মাঝে স্থির হয়ে গেলে গল্প বলা আবার শুরু হয়।

মাকে গাছের নিচে এগোতে দেখে বাবা সোজা হয়ে দাঁড়ায়। বাবার হাত থেকে পানির বোতল পড়ে যায়। আমাদের বাবা ভ্যাবলাকান্ত হয়ে যায়। বাবার জন্য আমার খুব মায়া হয়। একবার ভাবি যে মাকে বলি, আম্মা বাড়ি চলেন। কিন্তু বলতে পারি না। মা ততক্ষণে আমার হাত ছেড়ে দিয়ে বাজানের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। গিয়েই বলে, শোন,

তুমি কোথায় শিউলির মা? আমার হাত ধরো। একবার তোমাকে নিয়ে মেলায় গিয়েছিলাম। তখন মেয়েরা কেউ হয়নি। ভিড়ে তুমি হারিয়ে গিয়েছিলে। আবার থেমে যায় কণ্ঠ। মেয়েরা কান পেতে বাবার কথা শোনে। শুনতে পায় কণ্ঠস্বর, তোমাকে যখন খুঁজে পেলাম, তুমি বললে, আমার হাত ছেড়ে দিয়েছ কেন? অ্যাঁ–। তুমি খুব রাগ করেছিলে। আমি তো তোমার হাত ছাড়তে চাইনি রাশিদুন।

মেয়ে হয়েছে বলেই শয়তান লোকটা মেয়েটাকে এসিড খাইয়ে মারতে চেয়েছিল। আলাহর কাছে হাজার শোকর যে তুমি তেমন বাপ না। আমাকে তালাক দিয়ে ক্ষান্ত হয়েছিলে। আলাহ তোমাকে হাজার বছরের আয়ু দিক। তুমি শান্তিতে থাক আর আমার মেয়েগুলো বটগাছের ছায়ায় থাকুক।

মা কথা শেষ করে আমার হাত ছেড়ে দেয়। বলে, যা তুই বাড়ি যা। তোর বাজানকে নিয়ে যা।

বাজান তখনও হাঁ করে দাঁড়িয়েছিল। মুখটা অন্য দিকে ফিরিয়ে রেখেছিল। বাজান মায়ের মুখের দিকে সরাসরি তাকায়নি।

একবারও না?

না, একবারও না। মা যতক্ষণ কথা বলেছে মাথা নিচু করে রেখেছিল। আর মা হাঁটতে শুরু করলে আরেকদিকে তাকিয়ে ছিল।

আমি আস্তে করে বলি, বাজান বাড়ি চলেন।

বাজান আমার দিকে তাকায়। দম ফেলে। তারপর জিজ্ঞেস করে, তোর মা তোকে কি বলেছে রে? তোকে টুনটুনি ডেকেছে? তুই হওয়ার পর তোর মা আমাকে বলত এইটা আমাদের টুনটুনি। শিউলিকে ডাকত বাকবাকুম কবুতর। আর বকুলকে দোয়েল। বুঝলি তোরা তোর মায়ের কাছে ছিলি পাখি আর ফুল। একটু থেমে আবার বলে, হ্যাঁরে, তোর মা যেন তোকে কি বলেছে?

বলেছে, তোর বাজানকে নিয়ে বাড়ি যা।

শয়তান বলে নাই?

আমি অবাক হয়ে বলি, না তো। মা আপনাকে শয়তান বলে নাই।

আমি যে শুনলাম বলেছে, শয়তানটাকে নিয়ে বাড়ি যা।

বাজান, আপনি এইসব কি বলেন?

বাজান পড়ে যাওয়া পানির বোতল নিচু হয়ে তুলে নেয়। আমি বাজানের হাড়ভাঙা মেরুদণ্ড দেখি। জামার উপর দিয়েও মেরুদণ্ডের হাড় গোনা যায় মনে হয়। বাজান আবার জিজ্ঞেস করে, তোর মা কি বাড়িতে ঢুকেছে।

আমি তাকিয়ে দেখে বলি, না বাড়িতে ঢুকে নাই। দরজায় দাঁড়িয়ে আছে।

আমরা যতক্ষণ এখানে থাকব, সেও দাঁড়িয়ে থাকবে।

তাহলে চলেন যাই। সারাদিনে মায়ের অনেক কষ্ট হয়েছে।

কষ্ট? অনেক কষ্ট? পরের বাচ্চার জন্য তোর মায়ের কষ্ট হবে কেন?

মা তো ধাত্রী-মা। বাচ্চাদের নাড়ি কাটে। চলেন বাজান।

বাজান আর আমি হাঁটতে শুরু করি। পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখি মা বাড়িতে ঢুকেছে। বাজান পেছনে না তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে, তোর মা বাড়িতে ঢুকেছে।

হ্যাঁ, ঢুকেছে।

মানুষটা এমনই ছিল। কাজ শেষ না করে ভাত খেত না কখনো।

বাজান আপনি তো কখনো বলেননি যে মা আমাকে টুনটুনি ডাকত!

ভুলে গিয়েছিলাম। আর দরকার কি এইসব কথা মনে করার!

তাইতো, দরকার কি। আমরাও মায়ের কথা ছাইচাপা দিয়ে রাখব।

বাবা ঘুরে দাঁড়িয়ে আঙুল তুলে শাসিয়ে বলেছিল, খামোশ! এই কথা যেন আর না শুনি।

বাবা রেগে ভূত হয়ে গিয়েছিল। বাবার চেহারা দেখে আমি ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। আমি কাঁদতে কাঁদতে বলেছিলাম, বাজান এমন কথা আর বলব না।

বাবা আমার হাত ধরে টানতে টানতে বাড়িতে এনেছে। বাবার সঙ্গে হেঁটেতো আমি পারি না। কখনো দৌড়াই– সারা রাস্তা কোথাও না থেমে আসার জন্য আমার বুকে হাঁফ ধরে যায়।

হাস্নুহেনা থামলে পাথরখণ্ডরা আবার নড়েচড়ে বসে। একসময় পাথরের ফাঁকে ঝরনা বয়। হাসতে হাসতে বকুল বলে, বাজান এখনও মায়েরে ভালবাসে। তার স্বপ্ন দেখে। ঘুমের ঘোরে তার নাম জপে।

পদ্ম আকস্মিকভাবে চেঁচিয়ে বলে, বাজান কই?

তাইতো বাজান কই গেল?

বাজান বোধহয় রাস্তার ধারের চায়ের দোকানে গিয়ে বসেছে।

এতকথা না বলে চল বাজানরে খুঁজি। আগে বাড়িতে খুঁজব। তারপর রাস্তায়।

পাঁচবোন উঠোন পেরিয়ে রান্নাঘরের পেছনে আসতেই দেখতে পায় জয়নুল মিয়াকে। বালতির ওপর উপুড় হয়ে আছে।

হায়, হায় বাজান, বাজান গো–

পাঁচবোন জয়নুল মিয়াকে ধরে তুলতেই টের পায় জয়নুল মিয়ার জ্ঞান নাই। পাঁচবোন ধরাধরি করে বাবাকে নিয়ে এসে বারান্দায় শুইয়ে দেয়। বাতাস করে। ভেজা গামছা দিয়ে মুখ মুছিয়ে দেয়। কাঁথা এনে শরীরে জড়ায়। নিঃশ্বাসের ওঠানামা দেখে। বুকের ওপর কান পেতে ধুকধুক ধ্বনি শোনে।

ওদের মনে হয় বাড়িজুড়ে চারদিকে ধ্বনিত হচ্ছে বাবার কণ্ঠস্বর। বাবা একটু পরে দু'পাশে মাথা নাড়ায়। একটা বোকা ছেলের মত মাথা নাড়ানোর ভঙ্গি তার শরীরে ফুটে ওঠে। অস্ফুট স্বরে কি কি সব বলে। বলতে বলতে হঠাৎ করে চোখ খোলে আবার বন্ধ করে। নিঃশ্বাস পড়া দ্রুত হয়, একসময় স্থির হয় মাথা। মৃদুস্বরে বলে, শিউলির মা। আবার বিড়বিড় ধ্বনি। আবার থেমে যাওয়া। তুমি কোথায় শিউলির মা? আমার হাত ধরো। একবার তোমাকে নিয়ে মেলায় গিয়েছিলাম। তখন মেয়েরা কেউ হয়নি। ভিড়ে তুমি হারিয়ে গিয়েছিলে।

আবার থেমে যায় কণ্ঠ। মেয়েরা কান পেতে বাবার কথা শোনে। শুনতে পায় কণ্ঠস্বর, তোমাকে যখন খুঁজে পেলাম, তুমি বললে, আমার হাত ছেড়ে দিয়েছ কেন? অ্যাঁ–। তুমি খুব রাগ করেছিলে। আমি তো তোমার হাত ছাড়তে চাইনি রাশিদুন। কেমন করে যেন ছুটে গিয়েছিল। কেমন করে যে ছুটে গেল– আমার দিকে তাকিয়ে তুমি ফিক করে হেসেছিলে। আমি তোমাকে হাতভরা লাল চুড়ি কিনে দিয়েছিলাম। দুইজন হাত ধরাধরি করে বাড়ি ফিরেছিলাম।

জয়নুল মিয়ার ঘাড় কাত হয়ে যায়। চোখ বন্ধ। দু'হাত বারেবারে ওঠায়। কাউকে যেন খোঁজে, কিন্তু খুঁজে পায় না। বলতে থাকে, আমি তো তোমার হাত ছাড়তে চাইনি রাশিদুন। খোদার কসম, তুমি আমাকে বিশ্বাস কর। আমি তোমার হাত ছাড়তে চাইনি– আলাহর কসম, একদম ছাড়তে চাইনি। কি যে হল– কি যে–।

জয়নুল মিয়া বুকের ওপর দু'হাত জড়ো করে। মেয়েরা জলভরা চোখে বাবার দিকে তাকিয়ে থাকে। অপেক্ষা করে, তার জ্ঞান ফেরার জন্য।

• পরবর্তী সংখ্যায়

সেলিনা হোসেন কথাসাহিত্যিক

Standard Chartered

When businesses succeed, livelihoods flourish.

In 2009, we took the initiative to be first to align with the World Bank Group in boosting global trade flows. Since then, we have continued to be proactive in encouraging growth across our markets. As trade is the lifeblood of the local economy, our commitment does more than protect businesses. It stimulates the communities that depend on them.

Here for good

Discover more at
standardchartered.com/answers

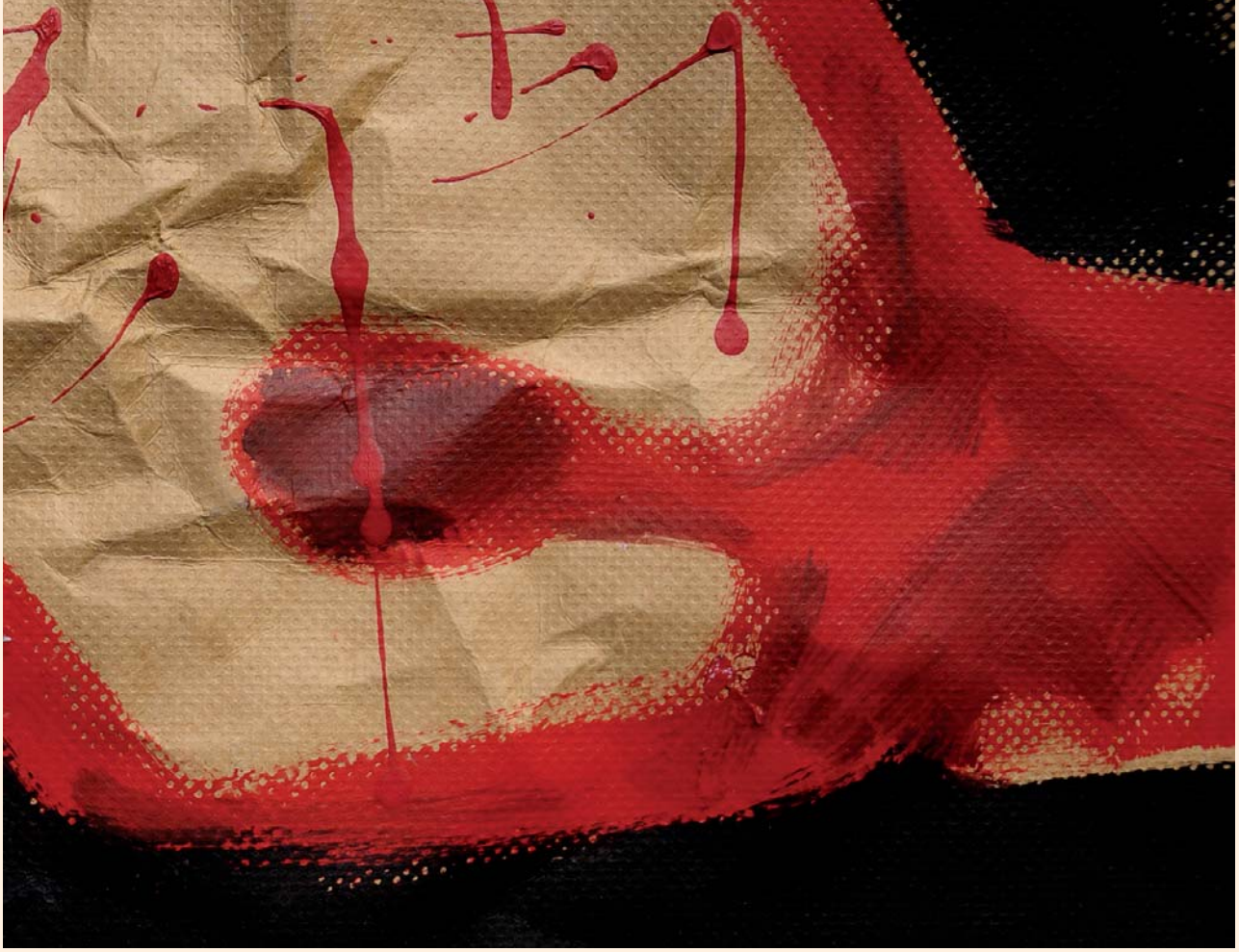

অনুবাদ গল্প

ভরা চাঁদের রাত

কৃষণ চন্দর

সেদিন ছিল এপ্রিল মাস। বাদামগাছের ডালগুলি ফুলে ভরে গেছে। বাতাস বরফের মত ঠাণ্ডা। তা সত্ত্বেও বসন্ত ঋতুর সৌন্দর্যের ইসারা পাওয়া গেছে। উঁচু উঁচু চূড়ার পাদদেশে সবুজ মখমলের মত দূর্বার উপর এখান্নেওখা নে বরফের টুকরো পড়ে আছে। দেখে মনে হয় সাদা ফুল ফুটে আছে। আগামী মাস পর্যন্ত এই সবুজ দূর্বার উপর এই সব সাদা ফুল শোভিত হয়ে থাকবে। দূর্বার রঙ হয়ে যাবে গাঢ় সবুজ, আর বাদামগাছের শাখাগুলিতে সবুজ সবুজ বাদামফল পোখরাজ্মণির মত ঝিক্মিক কর বে। আর নীল নীল পর্বতের মুখ থেকে কুয়াশা বিলীন হয়ে যাবে। এই ঝিলের পুলের ওপারে পাকদণ্ডীর মোলায়েম ধুলো ভেড়াগুলির আনন্দসূচক 'ব্লআ ' ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে উঠবে। আর এই উঁচু চূড়ার পাদদেশে রাখালেরা ভেড়াদের শরীর থেকে শরৎ ঋতুতে উপজিত মোটা পশম কাটবে আর গান গাইতে থাকবে।

কিন্তু এখন এপ্রিল মাস নয়। এখন পাহাড়ের চূড়ায় গাছের পাতা দেখা যায় না। এখন পাহাড়ের গায়ে রয়েছে বরফ আর কুয়াশা। এখন পাকদণ্ডী ভেড়ার ডাকে মুখরিত হয়ে ওঠেনি। এখন সমল ঝিলে কমলের দীপ জ্বলেনি। পদ্মপাতায় আচ্ছাদিত ঝিলের গভীর সবুজ জল আপন বুকের ভিতর লাখো লাখো পদ্ম এখন লুকিয়ে রাখেনি। ঐসব পদ্ম বসন্ত ঋতুর আগমনে ঝিলের বুকে স্তরে স্তরে সহজ মৃদু হাসির মত ফুটে উঠবে। পুলের কিনারে বাদামগাছের শাখাগুলিতে

পুলের রেলিঙ ধরে আমি অনেকক্ষণ তার প্রতীক্ষা করছিলাম। বিকেল শেষ হয়ে গেছে, সন্ধ্যা নেমে আসছে। বুল্লর ঝিলগামী হাউসবোটগুলি পাথরের থামগুলির মাঝখান দিয়ে চলে যাচ্ছিল। দিকচক্রবাল কাগজের নৌকার মত অস্পষ্ট আর ঝাপসা দেখাচ্ছিল। সন্ধ্যার আবীর রঙ ক্রমশ ঘনকালো হয়ে আসছিল। এখানে বাদামগাছগুলির আড়ালে পাকদণ্ডীপথ ঘুমি য়ে গেল। আর রাতের নিস্তব্ধতার মধ্যে প্রথম তারাটি কোন্‌এক পথি কের গানের মত মনে হল।

এখন কুঁড়ি ফুটিফুটি কর ছে। এপ্রিলের শেষ রাতে যখন বাদামের ফুলগুলি জাগতে শুরু করে আর বসন্ত ঋতুর দূতরূপে ঝিলের জলে আপন নৌকা ভাসায়, তখন ফুলের মত ছোট নরম ভেলাগুলি জলের উপর বসন্ত ঋতুর প্রতীক্ষায় নাচতে থাকে।

পুলের রেলিঙ ধরে আমি অনেকক্ষণ তার প্রতীক্ষা করছিলাম। বিকেল শেষ হয়ে গেছে, সন্ধ্যা নেমে আসছে। বুল্লর ঝিলগামী হাউসবোটগুলি পাথরের থামগুলির মাঝখান দিয়ে চলে যাচ্ছিল। দিকচক্রবাল কাগজের নৌকার মত অস্পষ্ট আর ঝাপসা দেখাচ্ছিল। সন্ধ্যার আবীররঙ ক্রমশ ঘনকালো হয়ে আসছিল। এখানে বাদামগাছগুলির আড়ালে পাকদণ্ডীপথ ঘুমি য়ে গেল। আর রাতের নিস্তব্ধতার মধ্যে প্রথম তারাটি কোন্‌এক পথি কের গানের মত মনে হল। বাতাসের শিরশিরানি অসহ্য হয়ে উঠল আর নাকের পাটা বাতাসের বরফ স্পর্শে অসাড় হয়ে গেল।

আর ঐ যে চাঁদ উঠল।

আর ঐ তো সে আসছে।

খুব দ্রুত পদক্ষেপে সে আসছে। বরং বলা যায় পাকদণ্ডীর ঢালু পথ বেয়ে সে দৌড়ে আসছে। ও একেবারে আমার সামনে এসে থেমে গেল আর ধীরস্বরে বলল, 'এই যে।'

দ্রুতলয়ে তার শ্বাস পড়ছে। মাঝে মাঝে শ্বাস বন্ধ হয়ে আবার দ্রুত চলছে। ও আমার কাঁধের উপর তার আঙুল দিয়ে স্পর্শ করল আর মাথাটি সেখানে রাখল। তার ঘন কালো কেশের রাশি আমার হৃদয়ে অনেক দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ল। তখন আমি তাকে বললাম, 'বিকেল থেকে আমি তোমার প্রতীক্ষা করছি।'

সে হেসে বলল, 'এখন রাত হয়ে গেছে। এ খুব সুন্দর রাত।'

সে তার নরম হাতখানি আমার অন্য কাঁধের উপর রাখল, যেন ফুলেভরা বাদা মের শাখাগ্র ঝুঁকে পড়ে আমার কাঁধের উপর শুয়ে পড়ল।

বেশ কিছুক্ষণ সে চুপ করে রইল। আমিও অনেকক্ষণ চুপ করে রইলাম। সে আপন মনে হেসে উঠল। ফের বলল, আমার বাবা পাকদণ্ডীর মোড় পর্যন্ত আমার সঙ্গে এসেছিল, কেননা আমি বলেছিলাম যে আমার ভয় করছে। আজ আমি আমার সখী রজ্জার বাড়িতে ঘুমাব। ঘুমাব না, জেগে থাকব। কারণ বাদামের প্রথম ফল ধরার আনন্দে আমরা সব সখী মিলে সারা রাত গান গাইব। আর সেই জন্যেই তো বিকেল পর্যন্ত এখানে আসার জন্য তৈরি হচ্ছিলাম। কিন্তু ধান ঝাড়তে হল। কাল এই কাপড় জোড়া ধুয়েছিলাম, আজ তা শুকোয়নি। আগুনে সেঁকে তা শুকিয়েছি। আমার মা বনে জ্বালানি কাঠ কুড়োতে গেছে, এখন পর্যন্ত আসেনি। আর যতক্ষণ না মা আসছে ততক্ষণ আমি কী করে তোমার জন্য ভুট্টো, শুকনো খোবানি আর জরদালু নিয়ে আসি। দেখ, তোমার জন্য এই সবকিছু নি য়ে এসেছি। তুমি তো খালিখালি রাগ করে দাঁড়িয়ে আছ। আমার দিকে তাকিয়ে দেখ। আমি এসে গেছি। আজ ভরা চাঁদের রাত। এস, কিনারায় বাঁধা নৌকা খুলি আর ঝিলে বিহার করি।'

সে আমার চোখের দিকে গভীরভাবে তাকাল। আমি তার ভালবাসা আর বিচলিত ভাবের মধ্যে ডুবে যাওয়া চোখের মণির দিকে তাকালাম। এই সময় চাঁদের আলো ছড়িয়ে পড়েছিল। ঐ চাঁদ আমাকে বলছিল, 'যাও, নৌকা খুলে নিয়ে ঝিলে বিহার কর। আজ বাদামের প্রথম ফলের আনন্দউৎসব বে মেতে ওঠ। আজ ও তোমারই জন্য আপন সখী, বাবা, ছোট বোন, বড় ভাই– সবাইকে ধোঁকা দিয়েছে, কারণ আজ ভরা চাঁদের রাত আর বাদামের শুভ্র শীতল ফুল বরফের সোনার মত চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। আর কাশ্মীরের গীত বাচ্চাদের দুধের মত বুকে উৎসারিত হয়ে আসছে। তুমি ওর গলায় মোতির সাতনরী হার দেখেছ? এই গাঢ়লাল সাতনরী হার তার গলায় ঝুলিয়ে দাও আর বল, তুমি আজ রাতভর জাগবে। আজ কাশ্মীরে বসন্তের প্রথম রাত। আজ তোমার গলায় কাশ্মীরের গীত ফুটে উঠবে যেমন করে কেসর ফুল চাঁদনী রাতে ফুটে ওঠে– নাও, এই সাতনরী হার পরে নাও।'

তার বিচলিত চোখের মণির মধ্যে উঁকি দিয়ে চাঁদ এই সবকিছুই দেখছিল। কোন গাছ থেকে এক বুলবুল ডেকে উঠল, দূরের নৌকার আলো ঝলমল করে উঠল, আর পাহাড়ের কোলে দূরবর্তী গ্রাম থেকে ঢিমে তালে গান জেগে উঠল। গান আর বাচ্চাদের হাসি, পুরুষের ভারী গলার আওয়াজ আর বাচ্চাদের মিষ্টি মিষ্টি কথা শোনা গেল। দূরের কুটিরগুলি থেকে ধীরে ধীরে ধোঁয়া উঠছে আর রাতের রান্নার সুঘ্রাণ ভেসে আসছে। মাছ ভাত আর শাকের মৃদু নোনতা গন্ধ। আজ ভরা চাঁদের রাতে ভরা যৌবন জেগে উঠেছে। আমার রাগ ধুয়ে গেল। আমি তার হাত আমার হাতে নিয়ে বললাম, 'এস, ঝিলে বিহার করি।'

নৌকা পুল ছাড়িয়ে গেল। পাকদণ্ডী পিছনে পড়ে রইল। বাদাম গাছের সারি শেষ হয়ে গেল। সোপানশ্রেণি রইল পিছনে পড়ে। এখন আমরা ঝিলের কিনারে কিনারে চলেছি। ঝোপে ঝোপে ব্যাঙ আর ঝিঁঝি পোকা ডাকছে। তাদের ডাক অর্থহীন গানের মত বেজে উঠছে। এক স্বপ্নালু পরিবেশ। যেন প্রেমের প্রতীক্ষায় ঘুমন্ত ঝিলের বুকে চাঁদের প্রতিবিম্ব নিথর হয়ে আছে। হাজার হাজার বছর ধরে এইভাবেই প্রতীক্ষা করছে– আমার ও তার প্রেমের প্রতীক্ষা করছে। তোমার আর তোমার প্রেমিকার মুচকি হাসির প্রতীক্ষায় রয়েছে। মানুষের জন্য মানুষের আকাঙ্ক্ষা প্রতীক্ষায় রয়েছে। এই ভরা চাঁদের সুন্দর নির্মল রাত যেন কোন কুমারীর অস্পৃষ্ট শরীরের মত প্রেমের পবিত্র স্পর্শের প্রতীক্ষায় রয়েছে।

ঝিলের কিনারায় বেড়েওঠা এক খোবানিগাছের গোড়ায় নৌকা বাঁধলাম। এখানে মাটি খুব নরম আর চাঁদের আলো পাতার আড়াল থেকে ছেঁকে এসে পড়ছে। ধীরে ধীরে ব্যাঙ ডাকছে। ঝিলের জল বারবার তটভূমিকে চুম্বন করে যাচ্ছে আর বারবার চুম্বনের শব্দ আমার কানে ভেসে আসছে। আমার দুহাত দি য়ে তার কোমর জড়িয়ে ধরলাম আর তাকে সজোরে বুকে চেপে ধরলাম। ঝিলের জল বারবার তটভূমিকে চুম্বন করে যাচ্ছে। আমি প্রথমে তার দুই আঁখিতে চুমু খেলাম আর ঝিলের বুকে যেন অসংখ্য কমল ফুটে উঠল। আমি আবার তার গালে চুমু খেলাম আর নির্মল কোমল ঝিরঝিরে হাওয়া যেন হঠাৎ শতশত গান গেয়ে উঠল। আমি আবার তার ঠোঁটে চুমু খেলাম আর অসংখ্য মন্দিরমসজিদগিজ া থেকে যেন গম্ভীর প্রার্থনার মন্ত্র উচ্চারিত হল আর ধরিত্রীআকা শের তারউড় ন্ত বাজপাখি– সবাই মিলে নাচতে শুরু করল। আমি আবার তার চিবুক চুম্বন করলাম আবার তার ঘাড়ে চুমু খেলাম আর ফুলের কুঁড়ির মত কমল যেন খুলতে আর বন্ধ হতে লাগল। আর গানের সুর জেগে উঠে স্তিমিত হয়ে এল আর জগৎব্যাপী নাচ ঢিমে লয়ে এসে ধীরে ধীরে থেমে গেল। এখন ঐ ব্যাঙের ডাক, ঐ ঝিলের জলের কোমল চুম্বন যেন কোন নায়িকার জন্য ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে উঠছিল।

আমি ধীরে নৌকা খুলে দিলাম। সে নৌকায় উঠে বসল। আমি হাতে বৈঠা নিলাম আর ঝিলের মাঝখানে নৌকা চালিয়ে নিয়ে গেলাম। এখানে নৌকা আপনি থেমে গেল। এদিকেও যায় না, ওদিকেও যায় না। আমি বৈঠা তুলে নিয়ে নৌকায় রেখে দিলাম। সে উঠে পুঁটলি খুলল। তার থেকে জরদালু বের করে আমাকে দিল আর নিজেও খেতে শুরু

সেদিনের ভরা চাঁদের রাত আমি আজ পর্যন্ত ভুলিনি। আজ আমার বয়স সত্তরের কাছাকাছি হল। কিন্তু সেই ভরা চাঁদের রাত আমার মনে এমন জ্বল জ্বল করছে যেন তা গতকাল ঘটেছিল। এমন পবিত্র প্রেমের স্বাদ আমি আজ পর্যন্ত পাইনি। স্লেও পায়নি। সেদিনের জাদু ছিল অন্যরকম। সেই ভরা চাঁদের রাতে আমরা দু'জনে একে অপরের সঙ্গে এমনভাবে মিলে গিয়েছিলাম যে সে রাতে ঘরেও যাইনি। ঐ রাতে সে আমার সঙ্গে পালিয়ে গিয়েছিল। আমরা পাঁচ্ছ 'দিন প্রেমে হারিয়ে গিয়েছিলাম।

করল।

জরদালু ছিল শুকনো আর টক্কমি ষ্টি।

সে বলল, 'এগুলি গত বসন্তের।'

আমি জরদালু খেতে লাগলাম আর ওর দিকে দেখতে লাগলাম।

সে ধীরে বলল, 'গত বসন্তে তুমি ছিলে না।'

গত বসন্তে আমি ছিলাম না। সেদিন জরদালু গাছ ফুলে ফুলে ভরে গিয়েছিল আর শাখাগ্র একটু হেলে পড়লেই মোতির মত ফুল ছড়িয়ে পড়ছিল। গত বসন্তে আমি ছিলাম না আর জরদালু গাছ ফলে ফলে নত হয়েছিল। সবুজ সবুজ জরদালু। নুন্নলংকা দি য়ে প্রচুর জরদালু লোকে খেত আর জিভে জল টানত আর তাদের নাক দিয়ে জল ঝরত। আবার টক জরদালুও লোকে খেত। গত বসন্তে আমি ছিলাম না। সেদিন সবুজ সবুজ জলদালু পেকে হলুদ, সোনালি আর লাল হয়ে যেত। আর ডালে ডালে খুশিভরা লাল লাল ফুল ঝুলে থাকত। ওর খুশিভরা সরল উজ্জ্বল দু'টি চোখ ঝুলে পড়া ঐ ফুলের গুচ্ছ দেখে নেচে উঠত। গত বসন্তে আমি ছিলাম না... আর সুন্দর দু'টি হাতে সে লাল্ললাল জরদালু সংগ্রহ করত। আর সুন্দর দু'টি ঠোঁট জলদালুর তাজা রস চুষে নিত। সে তাদের ঘরের ছাতে জরদালু ফল শুকোবার জন্য বিছিয়ে দিত। এই জরদালু যেদিন শুকিয়ে যাবে, সেদিন এক বসন্ত চলে যাবে আর দ্বিতীয় বসন্ত আসার সময় হবে, সেদিন আমি আসব আর জরদালুর স্বাদ নিয়ে খুশি হব।

আমরা দু'জনে জরদালু খাওয়ার পর শুকনো খোবানি খেলাম। এমনিতে খোবানি খুব মিষ্টি মনে হয় না কিন্তু যখন তা মুখের মধ্যে গিয়ে গলে যায় তখন তা মধু আর গুড়ের স্বাদ দিতে থাকে।

আমি বললাম, 'এগুলি নরম নরম, খুব মিষ্টি লাগছে।'

সে দাঁত দিয়ে একটা বিচি ভাঙল আর খোবানির বীজ বের করে আমায় দিল, 'খাও।'

ঐ বিচি বাদামের মত মিষ্টি।

সে বলল, 'এ রকম খোবানি আমি কখনো খাইনি। এ আমাদের আঙিনার গাছের ফল। আমাদের এখানে খোবানির এই একটিই গাছ আছে, কিন্তু এত বড় এত মিষ্টি খোবানি হয় যে তোমাকে আমি কী বলব! যখন খোবানি পাকে তখন আমার সব সখী এক হয়ে খোবানি খাওয়াতে বলে। গত বসন্তে...'

আর আমি ভাবলাম, গত বসন্তে আমি ছিলাম না কিন্তু আঙিনায় খোবানির গাছ এমনিভাবেই দাঁড়িয়ে ছিল। গত বসন্তে এই গাছ কচি কচি পাতায় ভরে গিয়েছিল আর তাতে কচি সবুজ ছুঁচালো খোবানি ফল কিছু ধরেছিল। এখন তাতে কচি কচি খোবানি হয়েছে। আর কাঁচা টক ফল দুপুরের আহারে চাটনির কাজ দেয়। গত বসন্তে আমি ছিলাম না, তখন এই খোবানিতে বিচি হয়েছিল আর খোবানির রঙ তার মাধুর্যে সবুজ বাদামকে মাত্ করে দিয়েছিল। গত বসন্তে আমি ছিলাম না। সেদিন এই লাল্ললাল খোবানি আপন রঙে সুন্দরী যুবতীদের মত সুন্দর আর তাদের মতই রসালো হয়ে উঠেছিল। সবুজ সবুজ পাতার ওড়নার আড়াল থেকে তারা উঁকি দিচ্ছিল। কচি কচি মেয়ে আঙিনায় নাচতে শুরু করেছিল আর ছোট ভাই গাছের উপর চড়ে খোবানি ছিঁড়ে ছিঁড়ে বোনের সখীদের জন্য নিচে ফেলছিল। গত বসন্তের খোবানি কত মিষ্টি আর রসালো ছিল... সেদিন আমি ছিলাম না। খোবানি খাওয়ার পর সে ভুট্টা দানা বার করল। তার এমন সোঁদা সোঁদা সুগন্ধ... সোনালি সেঁকা ভুট্টা ঠিক যেন মোতির আভাযুক্ত। দানাগুলি মুচমুচে আর মিষ্টি।

সে বলল, 'এ হল মিষ্টি ভুট্টার দানা।'

আমি ভুট্টা খেতে খেতে বললাম, 'খুব মিষ্টি।'

সে বলল, গত ঋতুর স্বাদ লেগে রয়েছে এই দানাগুলিতে। মাকে লুকিয়ে এগুলি রেখে দিয়েছিলাম।'

আমি মকাইয়ের একদিক থেকে দানা খেয়েছিলাম। কয়েক পঙ্‌ক্তি দানা রেখে দিয়েছিলাম। সে ঐখান থেকেই দানা খেয়েছিল আর কিছুটা আমার জন্যে রেখে দিয়েছিল। আমি তা খেলাম। এইভাবে আমরা দু'জনে একই ভুট্টা খেতে থাকি। তখন আমি ভেবেছিলাম এই মিষ্টি ভুট্টা কতই না মিষ্টি। এ হল গত বসন্তের ফসল, তখন তুমি ছিলে কিন্তু আমি ছিলাম না। তখন তোমার বাবা খেতে হাল চালিয়েছিল, খেতের মাটি আলগা করে দিয়েছিল, বীজ রন্নয়েছিল, বর্ষার জল দিয়েছিল। ধরিত্রী সেদিন সবুজ রঙের ছোট ছোট গাছ উঠিয়েছিল আর তুমি নালা বানিয়েছিলে। মকাইয়ের ছোট ছোট গাছ বড় হয়ে গিয়েছিল আর সেগুলির মাথায় শীষ এসেছিল, হাওয়ায় সেগুলি দুলছিল আর মকাইয়ের সবুজ ভরা দানাগুলি ফুটে উঠছিল। সেগুলির কোমল ছালের উপর যদি একটু নখ লেগে যেত তো ভুট্টার দুধ বেরিয়ে যেত। এসব নরম লাজুক ভুট্টা ধরিত্রী উৎপন্ন করেছিল। সেদিন আমি ছিলাম না। আর সেই সব ভুট্টাগাছ পরিপুষ্ট তাগড়া হয়ে গিয়েছিল। ভুট্টার দানায় রস এসেছিল। তখন দানায় নখ লাগালে কিছুই হত না, নিজেরই নখ ভেঙে যাওয়ার ভয় থাকত। ভুট্টার খোসা আগে ছিল হলুদ। এখন তা সোনালি ও শেষে কালো হয়ে গেল। ভুট্টার রঙ মাটির মত বাদামি হয়ে গেল তখনো তো আমি আসিনি। তারপর খেতের স্থানে স্থানে শস্য সঞ্চিত হল আর সেই সঞ্চিত শস্য বলদ দিয়ে মাড়ানো হল। তার ফলে ভুট্টার দানাগুলি আলাদা হয়ে গেল। তখন সখীদের নিয়ে তুমি প্রেমের গান গেয়েছিলে। ভুট্টা লুকিয়ে আর সেঁকে নিয়ে তুমি আলাদা করে রেখে দিয়েছিলে। সেদিন আমি ছিলাম না। ধরিত্রী ছিল, শস্য ছিল, আগুনে সেঁকা ভুট্টা ছিল কিন্তু আমি ছিলাম না।

আমি খুশির চোখে তার দিকে তাকিয়ে বললাম, 'আজ ভরা চাঁদের রাতে যেন আমার সব ইচ্ছেই পূরণ হয়ে গেল। কাল পর্যন্ত তা পূর্ণ হয়নি কিন্তু আজ পূর্ণ হয়েছে।'

সে আমার মুখে ভুট্টাদানা দিয়েছিল। তার ঠোঁটের গরম্নগরম স্পর্শ এখনো ভুট্টাদানায় লেগে আছে। আমি বললাম, 'তোমায় চুমু খাই?'

সে বলল, 'ধুৎ।... নৌকা ডুবে যাবে।'

আমি শুধালাম, 'তাহলে কী করা যায়?'

সে বলল, 'নৌকা ডুবতে দাও।'

সেদিনের ভরা চাঁদের রাত আমি আজ পর্যন্ত ভুলিনি। আজ আমার বয়স সত্তরের কাছাকাছি হল। কিন্তু সেই ভরা চাঁদের রাত আমার মনে এমন জ্বল জ্বল করছে যেন তা গতকাল ঘটেছিল। এমন পবিত্র প্রেমের স্বাদ আমি আজ পর্যন্ত পাইনি। স্লেও পায়নি। সেদিনের জাদু ছিল অন্যরকম। সেই ভরা চাঁদের রাতে আমরা দু'জনে একে অপরের সঙ্গে এমনভাবে মিলে গিয়েছিলাম যে সে রাতে ঘরেও যাইনি। ঐ রাতে সে আমার সঙ্গে পালিয়ে গিয়েছিল। আমরা পাঁচ্ছ 'দিন প্রেমে হারিয়ে গিয়েছিলাম। বাচ্চাদের মত জঙ্গলের এখানে ওখানে, নদ্দীনালার কিনারে, আখরোট গাছের ছায়াতলে ঘুরে বেড়িয়েছিলাম। ঐ বিলের ধারে আমি একটি কুটির কিনেছিলাম আর দু'জনে সেখানে বাস করেছিলাম। এক মাস বাদে আমি শ্রীনগর গিয়েছিলাম। তাকে বলে গিয়েছিলাম যে, আমি তিনদিন পরে ফিরে আসব। তৃতীয় দিনে আমি ফিরে এসেছিলাম। কিন্তু ফিরে এসে দেখি সে এক নবযুবকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে কথা বলছে। তারা দু'জনেই একই রেকাবি থেকে খানা

খাচ্ছে। একে অপরের মুখে গ্রাস তুলে দিচ্ছে আর হাসাহাসি করছে। আমি তাকে দেখেছিলাম কিন্তু সে আমাকে দেখতে পায়নি। তারা দু'জনে দু'জনের মধ্যে এতই মশগুল হয়েছিল যে অন্য কোনদিকে তাকায়নি। আমি ভাবলাম– এই নবযুবক গত বসন্ত বা তার আগের বসন্তের প্রেমিক। সেদিন তো আমি ছিলাম না। পরে বোধহয় এমন বসন্ত আরো কত আসবে। আবার কত ভরা চাঁদের রাত আসবে যখন প্রেম এক পতিতা নারীর মত অবশ হয়ে যাবে আর উলঙ্গ হয়ে নৃত্য করবে। যেমনভাবে বসন্তের পর পাতাঝরার দিন আসে তেমন ভাবেই আজ তোমার পাতাঝরার দিন এসে গেছে। আর এখানে আমার কী কাজ আছে? এই কথা ভেবে আমি তার সঙ্গে দেখা না করেই ফিরে চলে গিয়েছিলাম। আমার সেই প্রথম বসন্ত আর কোনদিন ফিরে আসেনি।

আর আজ আটচল্লিশ বছর পরে আমি সেখানেই ফিরে এসেছি। আমার সঙ্গে আমার ছেলেরা এসেছে। আমার স্ত্রী মারা গেছে। আমার পুত্রবধূরা আর তাদের ছেলেমেয়েরা আমার সঙ্গে এসেছে। আমরা বেড়াতে বেড়াতে সেই সময় ঝিলের কিনারে এসে গেছি। আবার সেই এপ্রিল মাস ফিরে এসেছে। বিকেল পেরিয়ে সন্ধ্যা হয়ে গেছে। আমি অনেকক্ষণ সেতুর ধারে দাঁড়ানো বাদামগাছের সারি দেখছি। ঠাণ্ডা বাতাসে সাদা ফুলের গুচ্ছ ভেসে বেড়াচ্ছে। কিন্তু পাকদণ্ডীর ধূলার পথে কোন চেনা পায়ের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে না। দেখতে পাচ্ছি এক সুন্দরী হাতে পুঁটলি নিয়ে সেতু পেরিয়ে চলে যাচ্ছে। তা দেখে আমার হৃদয় লাফিয়ে উঠছে। ঐ দূরে পাহাড় পেরিয়ে গ্রামে কোন স্ত্রী তার স্বামীকে ডাকছে। সে তাকে খেতে ডাকছে। কোথাও দরজা বন্ধ করার শব্দ শোনা যাচ্ছে আর একটি ক্রন্দনরত শিশু হঠাৎ চুপ করে যাচ্ছে। ছাত দিয়ে ধোঁয়া বেরুচ্ছে। কলরবকারী পাখির দল গাছের ঘন পাতাভরা শাখায় পাখা ঝাপটাচ্ছে আবার একেবারে নীরব হয়ে যাচ্ছে। কোন মাঝি গান গাইছে। তার কণ্ঠস্বর ধীরে ধীরে দিগন্তে বিলীন হয়ে যাচ্ছে।

আমি সেতু পেরিয়ে এগিয়ে চললাম। আলাদা আলাদা দলে ভাগ হয়ে আমার ছেলেরা, তাদের বউ ও ছেলেমেয়েরা আমার পিছনে আসছে। এখানে বাদামগাছের সারি শেষ হয়ে গেছে। খাড়াইপথ পেরিয়ে গিয়ে ঝিলের কিনারায় এসে গেছি। এই তো সেই খোবানির গাছ কিন্তু কত বড় হয়ে গেছে। কিন্তু এই নৌকা... এই নৌকা... কিন্তু এ কি সেই নৌকা? সামনে ঐ তো সেই কুটির। আমার প্রথম বসন্তের কুটির। আমার সেই ভরা চাঁদের প্রেম।

কুটিরে আলো দেখা যাচ্ছে, বাচ্চাদের কলরব শোনা যাচ্ছে। কেউ ভারী গলায় গান গাইছে। কোন এক বুড়ি তাদের চিৎকার করে থামিয়ে দিচ্ছে। আমি ভাবলাম, অর্ধশতাব্দী পেরিয়ে এলাম। এতদিন আমি ঐ কুটির দেখিনি। দেখতে দোষ কী? যাই হোক, আমিই তো ঐ কুটির কিনেছিলাম। যদি আমি ভাবি যে ঐ কুটিরের মালিক আমিই, তবে দেখতে দোষ কী? আমি কুটিরের ভিতরে ঢুকলাম।

কী সুন্দর ছোট্ট ছোট্ট বাচ্চা! এক যুবতী স্ত্রী তার স্বামীর জন্য রেকাবিতে খানা সাজিয়ে রাখছে। আমাকে দেখে সে সংকুচিত হয়ে গেল। দু'টি বাচ্চা লড়াই করছিল। আমাকে দেখে আশ্চর্য হয়ে চুপচাপ হয়ে গেল। যে বুড়ি এতক্ষণ পর্যন্ত সক্রোধে বকাবকি করছিল সে থামের আড়ালে এসে দাঁড়াল। বলল, 'কে তুমি?

আমি বললাম, 'এই বাড়ি আমার।'

বুড়ি বলল, 'হুঃ, একি তোর বাপের বাড়ি।'

আমি বললাম, 'আমার বাপের নয়, আমার। আটচল্লিশ বছর আগে আমি এটি কিনেছিলাম। এখন আমি এমনিই এ বাড়ি দেখতে এসেছি। আপনাদের এখান থেকে বের করে দিতে আসিনি। এখন তো এই বাড়ি আপনারই। আমি এমনিই...' এই কথা বলে আমি ফিরে চলে আসছি। বুড়ি আঙুল দিয়ে জোর করে থামটাকে চেপে ধরল। সে এক দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল। তারপর বলল, 'তাহলে সেই তুমিই... আজ এত বছর পরে কেউ কি কাউকে চিনতে পারে?...' সে অনেকক্ষণ থাম ধরে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। আমি নিচে আঙিনায় চুপ করে দাঁড়িয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইলাম। তারপর সে আপন মনেই হেসে উঠল। বলল, 'তাহলে এস, তোমার সঙ্গে আমার ঘরের লোকদের আলাপ করিয়ে দিই।... দেখ, এই আমার বড় ছেলে। এ ওর চেয়ে ছোট, ও বড় ছেলের বউ, ও আমার বড় নাতি। বাবা, প্রণাম করো। এ আমার বড় নাতনি... আর এ... এ আমার স্বামী, দেখ তো, ধুৎ। একে জাগিয়ো না। পরশু থেকে ওর অসুখ করেছে, ওকে ঘুমোতে দাও।'

সে আবার বলল, 'তোমার জন্যে কি করতে পারি?

আমি দেওয়ালের খুঁটিতে টাঙানো ভুট্টার দিকে তাকালাম... সেঁকা ভুট্টা, সোনালি মোতির মত উজ্জ্বল দানাগুলি।

আমরা দু'জনেই হেসে ফেললাম।

সে বলল, 'আমার তো অনেক দাঁত পড়ে গেছে আর যা আছে তা কাজে লাগে না।'

আমি বললাম, 'আমারো তো একই অবস্থা, ভুট্টা খেতে পারি না।'

আমাকে বাড়ির ভিতর ঢুকতে দেখে আমার আত্মীয়রাও ভিতরে চলে এল। তখন খুব হই চই হল। বাচ্চারা শিগগিরই একে অন্যের সঙ্গে মিলে মিশে গেল।

আমরা দু'জনে ধীরে ধীরে বাইরে চলে এলাম। ধীরে ধীরে ঝিলের কিনার ধরে হাঁটতে লাগলাম।

সে বলল, 'আমি তোমার জন্য ছ'বছর অপেক্ষা করেছি। তুমি সেদিন ফিরে এলে না কেন?'

আমি বললাম, আমি এসেছিলাম, কিন্তু অন্য এক নবযুবকের সঙ্গে তোমাকে দেখে ফিরে চলে গিয়েছিলাম।'

সে বলল, 'কি বলছ তুমি?'

'হ্যাঁ তুমি তার সঙ্গে একই রেকাবি থেকে খানা খাচ্ছিলে, তুমি তার মুখে সে তোমার মুখে গ্রাস তুলে দিচ্ছিলে।'

সে একেবারে চুপ হয়ে গেল, তারপর সজোরে হাসতে লাগল। আমি আশ্চর্য হয়ে শুধালাম, 'কী হল?'

সে বলল, 'আরে সে তো আমার সহোদর ভাই।'

সে আবার জোরে জোরে হাসতে লাগল। সে ঐদিনই আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। ঐ দিন তোমার আসার কথা ছিল। সে ফিরে যাচ্ছিল। আমি তাকে তোমার সঙ্গে দেখা করার জন্য আটকে রেখেছিলাম... কিন্তু তুমি তো এলে না।'

সে হঠাৎ চুপ করে গেল। ছ'বছর আমি তোমার জন্যে অপেক্ষা করেছিলাম। তুমি চলে যাবার পর ভগবান আমাকে একটি ছেলে দিয়েছিলেন, তোমারই ছেলে, কিন্তু এক বছর বাদে সে মারা গেল। চার বছর আমি তোমারই জন্যে অপেক্ষা করেছিলম, কিন্তু তুমি এলে না।'

খেলা করতে করতে এক বাচ্চা আরেক বাচ্চাকে ভুট্টা দিচ্ছিল। সে বলল, 'এটি আমার নাতি।'

আমি বললাম, 'এটি আমার নাতনি।'

বাচ্চা দু'টি দৌড়তে দৌড়তে ঝিলের কিনারে অনেক দূরে চলে গেল। আমরা অনেকক্ষণ তাদের দিকে তাকিয়ে রইলাম। সে আমার কাছে এল। বলল, আজ তুমি এসেছ বলে আমার খুব ভাল লাগছে। আমি আমার পথ বেছে নিয়েছি। এই জীবনের সুখ আর দুঃখ দেখেছি। আমার ঘর ভরে গেছে, আজ তুমি এসেছ। আমার একটুও খারাপ লাগছে না।'

আমরা দু'জনেই চুপ করে গেলাম। বাচ্চা দু'টি খেলতে খেলতে আমাদের কাছে ফিরে এল। সে আমার নাতনিকে কোলে তুলে নিল, আমি তার নাতিকে কোলে তুলে নিলাম। আমরা দু'জনে খুশি মনে একে অপরের দিকে তাকিয়ে দেখতে লাগলাম। তার চোখের মণিতে চাঁদ প্রতিবিম্বিত হচ্ছিল। ঐ চাঁদ আশ্চর্য খুশির সঙ্গে বলতে লাগল, 'মানুষ মরে যায়, কিন্তু জীবন মরে না। বসন্ত শেষ হয়ে যায়, কিন্তু জীবনের মহান শুদ্ধ প্রেম সর্বদা স্থির হয়ে থাকে। তোমরা দু'জনে গত বসন্তে ছিলে না। এই বসন্ত তোমরা দেখছ, আগামী বসন্তে তোমরা থাকবে না, কিন্তু জীবন আর প্রেম থাকবে, আর থাকবে যৌবন, সৌন্দর্য, মাধুর্য আর সরলতা...।'

বাচ্চা দু'টি আমাদের কোল থেকে নেমে পড়ল, তারা আলাদা খেলতে চাইছিল। তারা দৌড়তে দৌড়তে খোবানি গাছের কাছে চলে গেল, সেখানে নৌকা বাঁধা ছিল।

আমি শুধালাম, 'এ তো সেই গাছ?'

সে মুচকি হেসে বলল, 'না, এ অন্য গাছ।'

অনুবাদ **ড. অরূপকুমার মুখোপাধ্যায়**

কৃষণ চন্দর কালজয়ী উর্দু কথাশিল্পী

ব্যক্তিত্ব

আনিসুজ্জামান । বাঙালির বাতিঘর

বিশ্বজিৎ ঘোষ

১৯৮৩ সালে এম এ পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হলে আমাদের শিক্ষক ড. আবু হেনা মোস্তফা কামাল স্যারের বাসায় যাই, উদ্দেশ্য স্যারের আশীর্বাদ নেওয়া। অনেক কথা হল স্যারের সঙ্গে, বললেন: পরীক্ষায় ভাল ফল করলেন, এখন কী করবেন? জানালাম, শিক্ষকতাই প্রথম এবং একমাত্র পছন্দ। মিনিটখানেক স্যার চুপ থাকলেন, তারপর বললেন, 'শিক্ষকতাই যখন করবেন, তখন লেখালেখি ও গবেষণার জগতে আপনাকে আসতেই হবে। কোন বিষয়ে গবেষণাধর্মী কিছু লেখার আগে আনিস সাহেবের *মুসলিমমানস ও বাংলা সাহিত্য* বইটা একবার ওল্টাবেন, অনেক উপকার হবে।' হেনা স্যারের সেদিনের কথাটা এখনো কানে বাজে এবং ভাবি, কী অব্যর্থ এক পরামর্শ আমাকে দিয়ে গেছেন সারা জীবনের জন্য।

হেনা সারের আনিস সাহেব আমাদের আনিস স্যার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর এমিরেটাস ডক্টর আনিসুজ্জামান। কেবল গবেষক হিসেবেই নয়, বহু উজ্জ্বল কৃতী ও কীর্তিতে অনন্য হয়ে উঠেছে একটি নাম– আনিসুজ্জামান। দেশের সীমানা ছাড়িয়ে আমাদের যে ক'জন মানুষ নিজেদের ছড়িয়ে দিতে পেরেছেন বিশ্বভূগোলে, আনিসুজ্জামান তাঁদের অন্যতম। সম্প্রতি ভারত সরকার *পদ্মভূষণ* উপাধিতে ভূষিত করেছেন আনিসুজ্জামানকে। তাঁর এই অর্জন গোটা বাঙালির জন্যই গৌরবের। লেখক, গবেষক, শিক্ষাচিন্তক, সংস্কৃতিসাধক, দেশপ্রেমিক, মুক্তিসংগ্রামী, মানবাধিকার সংগঠন, সর্বোপরি জাতির বিবেক– কতভাবেই তো আনিস স্যার নিজেকে মেলে ধরেছেন জাতির সামনে। একজন সংবেদনশীল প্রগতিপন্থী মানুষ হিসেবে তাঁর তুল্য ক'জন মানুষ আছেন আমাদের? কত বাঙালির নামই তো আছে আনিসুজ্জামান– তবু কেন জানি আনিসুজ্জামান নামটা

পুরনো বাংলা গদ্য সম্পর্কে আনিসুজ্জামানের গবেষণা বাংলা গদ্যের ইতিহাস রচনায় সঞ্চার করেছে অনেক নতুন উপাদান। পুরনো বাংলা গদ্য সম্পর্কে তাঁর গবেষণা গবেষক হিসেবে তাঁর নিষ্ঠা, প্রযত্ন ও দূরদৃষ্টির পরিচয়বহ। বাংলা গদ্যের বিকাশ সম্পর্কে উত্তরকালের গবেষকদের জন্য তিনি সঞ্চার করেছেন অতুল সহযোগ।

শুনলেই মনে জাগে সমাজসচেতন এক বুদ্ধিজীবী, দীপ্র এক মনীষার অবয়ব। সহজ সাবলীল স্বাভাবিকভাবে চলতে চলতে একজন মানুষ কী করে যে এমন অসাধারণ হয়ে উঠতে পারেন, তাঁর সান্নিধ্যে না গেলে স্লেকথা অনুধাবন করাও বোধ করি সম্ভব নয়। আনিস স্যারের কথা মনে হলেই কল্পচোখে ভেসে ওঠে শামসুর রাহমানের কবিতায় চিত্রিত অসামান্য এই পণ্ডিতের নিরাভরণ এই অবয়ব:

যখন পাঞ্জাবী আর পাজামা চাপিয়ে
শরীরে সকালে কিংবা বিকেলে একলা হেঁটে যান
প্রায় প্রতিদিন দীর্ঘকায় সবুজ ঘাসের
তলা দিয়ে তাকে বাস্তবিকই সাধারণ মনে হয়।

হ্যাঁ, এই সাধারণ মানুষটাই আমাদের কালের অসামান্য মনীষার এক অনন্য দৃষ্টান্ত। তাঁর *কাল নিরবধি* পাঠ করলেই অনুধাবন করা যাবে সাধারণের সীমানা পেরিয়ে তিনি কীভাবে পৌঁছে গেলেন অসাধারণের স্তরে। বাঙালি জাতির একটা পর্বের ইতিহাসের সঙ্গে আনিসুজ্জামানের নাম ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ১৯৫৩ সালে হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত *একুশে ফেব্রুয়ারি* গ্রন্থের উৎসর্গপত্রটির কথা আজ মনে পড়ছে। কী অসীম সাহসিকতার সঙ্গে সেদিনের কিশোর আনিসুজ্জামান মুক্তোর মত হস্তাক্ষরে স্লেগ্ন্থের জন্য লিখেছিলেন এই উৎসর্গ বয়ান: 'যে অমর দেশবাসীর মধ্যে থেকে জন্ম নিয়েছেন একুশের শহীদেরা, যে অমর দেশবাসীর মধ্যে অটুট হয়ে রয়েছে একুশের প্রতিজ্ঞা, তাদের উদ্দেশে।' পনের বছরের এক কিশোর পাকিস্তানি স্বৈরশাসকদের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে সেদিন নিজের হস্তাক্ষর মুদ্রিত করতে দিয়ে অসীম সাহসের পরিচয় দিয়েছিলেন। বাংলাদেশের সংবিধান বাংলায় অনুবাদ করে আনিসুজ্জামান পালন করেছেন এক ঐতিহাসিক ভূমিকা। মুক্তিযুদ্ধের সময় পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য হিসেবে তিনি পালন করেন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সার্বিক প্রেক্ষাপট ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীকে অবগত করানোর জন্য তাজউদ্দিন আহমদের সঙ্গে তিনি দিল্লি গিয়েছিলেন। আনিসুজ্জামানের *আমার একাত্তর* গ্রন্থ পাঠ করলেই জানা যাবে মুক্তিযুদ্ধের সময় তাঁর গভীর সংশ্লিষ্টতার কথা। মুক্তিযুদ্ধের সময় মানবতাবিরোধী অপরাধের সঙ্গে যারা জড়িত ছিল, তাদের প্রতীকী বিচারকার্যে বিচারক হিসেবে অংশগ্রহণ করেও তিনি পালন করেছেন সামাজিক দায়বদ্ধতা, ওই দায়বদ্ধতা থেকেই যুদ্ধাপরাধীদের বিচার কার্যক্রমে আসামির বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে তিনি হাজির হন আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনালে। যখনই জাতীয়ভাবে জটিল কোন সংকটে আমরা পড়েছি, আনিসুজ্জামান সঙ্গে সঙ্গে জাতির পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন, কলম হাতে পত্রিকার পাতায় হাজির হয়েছেন সাহসী ভূমিকা নিয়ে।

মুক্তিযুদ্ধের সময় পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য হিসেবে তিনি পালন করেন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সার্বিক প্রেক্ষাপট ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীকে অবগত করানোর জন্য তাজউদ্দিন আহমদের সঙ্গে তিনি দিল্লি গিয়েছিলেন। আনিসুজ্জামানের আমার একাত্তর গ্রন্থ পাঠ করলেই জানা যাবে মুক্তিযুদ্ধের সময় তাঁর গভীর সংশ্লিষ্টতার কথা।

মুক্তবুদ্ধি ও মাঙ্গলিক চেতনা দ্বারা আজীবন পরিচালিত হয়েছেন আনিসুজ্জামান। তাঁর সব কর্মের পশ্চাতেই আছে অপরের জন্য মঙ্গল বাসনা। নিজের স্বার্থকে অবলীলায় তিনি সবার স্বার্থের কাছে তুচ্ছ করে তুলতে পারেন, অন্যের মঙ্গলকে ভাবতে পারেন নিজের মঙ্গল হিসেবে। এমন সজ্জন মানুষ, সুরুচির অধিকারী এমন পণ্ডিত আমাদের সমাজ কেন, যে কোন সমাজেই বিরল। মানুষের সঙ্গে তিনি মিশতে পারেন সাবলীলভাবে, তাঁর পাণ্ডিত্য সে ক্ষেত্রে কখনো বাধা হয়ে দাঁড়ায় না। অদ্ভুত এক নির্মোহ দিয়ে নিজেকে উহ্য রাখতে পারেন আনিসুজ্জমান, তাঁর আত্মজীবনী পাঠ করলেই বোঝা যায় দেশজীবনই হয়ে ওঠে তাঁর আত্মজীবন– নিজে সেখানে কেবলই কথকমাত্র। সন্দেহ নেই, আমাদের আমিময় সমাজে এও এক বিরল গুণ।

গবেষক হিসেবে আনিসুজ্জামানের খ্যাতি ও সিদ্ধি শিখরস্পর্শী। পঁচিশ বছর বয়স পূর্ণ হবার আগেই *মুসলিমসানস ও বাংলা সাহিত্য* শীর্ষক পিএইচ ডি অভিসন্দর্ভ রচনা করে তিনি তাঁর অনন্য মেধার স্বাক্ষর রেখেছেন। ইংরেজ আমলের বাংলা সাহিত্যে বাঙালি মুসলিম লেখকদের অবদান বস্তুনিষ্ঠ ও উপাত্তঋদ্ধ হয়ে বক্ষ্যমাণ গ্রন্থে আলোচিত হয়েছে। এই আলোচনায় আনিসুজ্জামানের সাফল্য যে কত ব্যাপক আমাদের আরেক নক্ষত্র ড. আহমদ শরীফের মূল্যায়ন থেকেই তা অনুধাবন করা যায়। আহমদ শরীফ লিখেছেন:

'সাম্প্রতিকালে যে কয়টি বাংলা Doctoral Thesis বের হয়েছে, সে সবের মধ্যে ডক্টর আনিসুজ্জামানের গ্রন্থটি শ্রেষ্ঠ বলে মনে করি। এ এমন একটি বই যা একবার পড়ে ফেলে রাখবার মত নয়, বারবার পড়ার প্রয়োজন এবং প্রতিবারেই নতুন নতুন তথ্য ও তত্ত্বের উদ্ভাস ঘটে এবং চিন্তার উদ্দীপন হয়। সব ভালো গ্রন্থই অভিনব চিন্তার খোরাক জোগায় আর তৃপ্তি দেয়, এটি তেমন একটি বই।... লেখক অনাসক্ত ঐতিহাসিকের দৃষ্টি এবং নিরপেক্ষ বিচারকের মন নিয়ে স্থিতধী বিশ্লেষকের দায়িত্ব কৃতিত্বের সঙ্গেই পালন করেছেন। এ গ্রন্থ কেবল লেখকেরই গৌরবের বস্তু নয়, পূর্ব পাকিস্তানের বিদ্বানসমাজেরও গর্বের হেতু।'

পুরনো বাংলা গদ্য সম্পর্কে আনিসুজ্জামানের গবেষণা বাংলা গদ্যের ইতিহাস রচনায় সঞ্চার করেছে অনেক নতুন উপাদান। পুরনো বাংলা গদ্য সম্পর্কে তাঁর গবেষণা গবেষক হিসেবে তাঁর নিষ্ঠা, প্রযত্ন ও দূরদৃষ্টির পরিচয়বহ। বাংলা গদ্যের বিকাশ সম্পর্কে উত্তরকালের গবেষকদের জন্য তিনি সঞ্চার করেছেন অতুল সহযোগ। এ প্রসঙ্গে তাঁর *Factory Correspondence and other Bengali Documents in the India Office Library and Records* (1981), *আঠার শতকের বাংলা চিঠি* (১৯৮৩), *পুরনো বাংলা গদ্য* (১৯৮৪)– এসব বইয়ের কথা স্মরণ করা যায়। এসব গ্রন্থ পাঠ করলে ষোল থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বাংলা গদ্যভাষার বিকাশ ও স্বরূপবৈশিষ্ট্য সম্পর্কে একটা স্বচ্ছ ধারণা লাভ করা যায়।

আত্মজীবনীর ধারায় আনিসুজ্জামানের *কাল নিরবধি* এক বিশিষ্ট সংযোজন। এ গ্রন্থে তাঁর নিজের কথা যত না উঠে এসেছে, তার চেয়ে অনেক বেশি ফুটে উঠেছে পরিবর্তমান সময় ও সমাজ এবং পরিপার্শ্বের ছবি। কাল নিরবধি পাঠ করে বোঝা যায়, আনিসুজ্জামান ইতিহাসের স্রোতে নিজেকে সমর্পণ করেননি, বরং ইতিহাসের ধারাকে গড়তে চেয়েছেন আপন চেতনা ও বিশ্ববীক্ষার আলোকে।

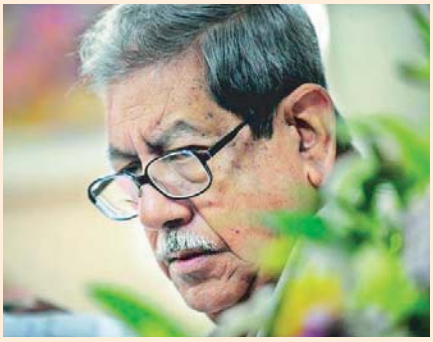

বাংলা সাহিত্যের অনেক লেখক সম্পর্কে আনিসুজ্জামান গবেষণা করেছেন, গ্রন্থ রচনা করেছেন। মুনীর চৌধুরী, মোতাহের হোসেন চৌধুরী, অজিত গুহ, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ প্রমুখ লেখক সম্পর্কে তাঁর গবেষণা বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছে। বাঙালি নারী বিষয়ে তাঁর গবেষণা পি-তজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। তাঁর বই প্রকাশিত হয়েছে পৃথিবীর অনেক দেশ থেকে, Anowar Abdel Malek-এর স ঙ্গে যুগ্মলেখক হিসেবে বই লিখেছেন তিনি, ইউনেস্কোর অনুরোধে বিশ্বসংস্কৃতি সম্পর্কে গ্রন্থ সম্পাদনা করেছেন তিনি। বাংলা ও ইংরেজি উভয় ভাষায় তাঁর দক্ষতা কিংবদন্তিতুল্য। অনুবাদক হিসেবে আনিসুজ্জামানের অবদানের কথাও এখানে উল্লেখ করতে হয়। অস্কার ওয়াইল্ড, আলেক্সেই আরবুঝভের নাটক বাংলায় রূপান্তর করেছেন। প্রথম যৌবনে গল্প লিখেছেন– জানি না স্লেসব গ ল্প স্যারের কাছে এখন আছে ক্কিনা। প্রসঙ্গত মনে পড়ে, হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত *একুশে ফেব্রুয়ারি*তে প্রকাশিত তাঁর 'দৃষ্টি' নামের ছোটগল্পের কথা। আনিসুজ্জামানের ছোটগল্পসমূহ প্রকাশিত হলে পাঠকের কাছে তাঁর ভিন্ন একটা পরিচয় উদ্ভাসিত হত।

বাংলা ভাষায় আত্মজীবনীর ধারায় আনিসুজ্জামানের *কাল নিরবধি* এক বিশিষ্ট সংযোজন। এ গ্রন্থে তাঁর নিজের কথা যত না উঠে এসেছে, তার চেয়ে অনেক বেশি ফুটে উঠেছে পরিবর্তমান সময় ও সমাজ এবং পরিপার্শ্বের ছবি। *কাল নিরবধি* পাঠ করে বোঝা যায়, আনিসুজ্জামান ইতিহাসের স্রোতে নিজেকে সমর্পণ করেননি, বরং ইতিহাসের ধারাকে গড়তে চেয়েছেন আপন চেতনা ও বিশ্ববীক্ষার আলোকে। সারল্য, মাধুর্য, স্মৃতিসূক্ষ্মতা এবং কৌতুকের সমন্বয়ে এমন নিরাসক্ত আত্মজীবনী বাংলা সাহিত্যে খুব বেশি পাওয়া যাবে না। আনিসুজ্জামানের গদ্যরীতির বিশিষ্ট লক্ষণ কৌতুকময়তা। *কাল নিরবধি*তে যেমন পাওয়া যায় কৌতুকের খেলা, তেমিন পাওয়া যায় ব্যক্তিগত রচনার সংকলন *আমার চোখে* গ্রন্থে। ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহবিষয়ক এক রচনা থেকে আনিসুজ্জামানের কৌতুকবোধের পরিচয় নেওয়া যেতে পারে:

'কিন্তু গুরুর সঙ্গে তাঁর একালের ছাত্রদের মর্মগত মিল খুব সামান্যই আছে। তিনি বহুভাষাবিদ ছিলেন; বহু ভাষাশিক্ষা আমাদের যুগপ্রবৃত্তি নয়। তাঁর বিশিষ্ট সাধনক্ষেত্র ছিল তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব; এ কাল বর্ণনামূলক ভাষাতত্ত্বের জয়পতাকা উড়িয়েছে। তিনি যেমন স্বধর্মনিষ্ঠ ছিলেন, তেমনি তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বে পণ্ডিত ছিলেন; ধর্মবিষয়ে আমরা উদাসীন; যাঁরা আগ্রহশীল, তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বে তাঁদের প্রবৃত্তি বা অধিকার নেই। খর্বকায় দেহে তিনি বিশাল ব্যক্তিত্বের অধিকারী, আমরা অধিকাংশই পরানুকারী। প্রজ্ঞা ও পাণ্ডিত্যের সঙ্গে অপূর্ব বিনয়ের যোগ ঘটেছিল তাঁর মধ্যে; আমাদের কালে অপণ্ডিতেরও অবিনয়ে অধিকার।'

সাহিত্যগ বেষণার পাশাপাশি সাহিত্য সম্পাদনার ক্ষেত্রেও আনিসুজ্জামানের অবদানের কথা বিশেষভাবে স্মরণ করতে হয়। অনেক লেখকের রচনা তিনি সম্পাদনা করেছেন, সম্পাদনা করেছেন দুষ্প্রাপ্য অনেক বই। অনেক স্মারকগ্রন্থ বা সংবর্ধনা গ্রন্থের সম্পাদক তিনি। তাঁর সম্পাদনায় বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত হয়েছে *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস* গ্রন্থের দু'টি খণ্ড। তবে সম্পাদনার ক্ষেত্রে তাঁর সবচেয়ে গৌরবজনক কাজ ১৯৬৮ সালে প্রকাশিত *রবীন্দ্রনাথ* শীর্ষক গ্রন্থ। রবীন্দ্রবর্জনের সেই স্বৈরবৃত্তকালে *রবীন্দ্রনাথ* প্রকাশ ছিল রীতিমত এক বিদ্রোহ। রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে তাঁর আরো কিছু প্রয়াসের কথা বলা যায়। রবীন্দ্রনাথের সার্ধশত জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আনিসুজ্জামানের সম্পাদনায় বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশ করেছে অসাধারণ এক বই, ঢাকা থেকেও তাঁর সম্পাদনায় অভিন্ন উপলক্ষে প্রকাশিত হয়েছে একাধিক গ্রন্থ। সম্পাদনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অধুনা একমাত্র নিয়মিত সাহিত্য পত্রিকা *কালি ও কলম*এর কথাও এখানে উল্লেখ করা যায়। ওই পত্রিকার সম্পাদনা পরিষদের তিনি সভাপতি।

ড. আনিসুজ্জামান কেবল সাহিত্যগ বেষক নন; তাঁর গবেষণায় সমাজ, রাজনীতি, ধর্ম, নৃতত্ত্ব, অর্থনীতি– সবকিছু একাকার হয়ে গেছে। নির্মোহ বস্তুনিষ্ঠ এবং সুমিত ভাষার জন্য তাঁর যে কোন গ্রন্থ সুখপাঠ্য এবং কৌতূহলোদ্দীপক। তাঁর গ্রন্থ পাঠ করলে জ্ঞানের উত্তাপ পাওয়া যায়, শুধরে যায় পাঠকের সীমাবদ্ধতার প্রান্তগুলো। সম্প্রতি এই গুণী ভারত সরকারের পক্ষ থেকে পদ্মভূষণ সম্মানে ভূষিত হয়েছেন। ১৯৫৪ সাল থেকে ভারত সরকার বিভিন্ন গুণী ব্যক্তিকে উচ্চমানের বিশিষ্ট সেবার জন্যে এ সম্মান প্রদান করে আসছে। আনিসুজ্জামানের সম্মান বাংলাদেশের সম্মান বলে আমরা মনে করি।

সামাজিক মনস্বিতা বলতে যা বোঝায়, আনিসুজ্জামানের মাঝে আমরা পেয়ে যাই তার সাড়্গাৎ। এমন মনস্বিতাঋদ্ধ মানুষ আমাদের সমাজে একান্তই দুর্লভ। সমষ্টির কল্যাণ ও মঙ্গলকাক্ষী একজন মনীষী আনিসুজ্জামান আমাদের আছেন– এ আমাদের পরম গৌরব। তিনি আমাদের দুর্দিনের বাতিঘর। মনীষার উজ্জ্বল প্রতিকৃতি আনিসুজ্জামান সম্পর্কে সৈয়দ শামসুল হকের চরণগুচ্ছ দিয়েই শেষ করি আমার এই লেখা:

মানুষ নেয় জন্ম এবং মানুষ বড় হয়–
বয়সে বড় হয় সকলে, কর্মে কতিপয়।
এক জীবনের অর্জন কি এক কথাতে বলা যায়?
প্রতিদিনের চিত্রলেখা দিনের শেষে মুছে যায়।
সবটাই কি মুছতে পারে কালের হাত চলমান?
অমোচ্য যে নামগুলো তার একটি আনিসুজ্জামান।

ড. আনিসুজ্জামান কেবল সাহিত্য গবেষক নন; তাঁর গবেষণায় সমাজ, রাজনীতি, ধর্ম, নৃতত্ত্ব, অর্থনীতি– সবকিছু একাকার হয়ে গেছে। নির্মোহ বস্তুনিষ্ঠ এবং সুমিত ভাষার জন্য তাঁর যে কোন গ্রন্থ সুখপাঠ্য এবং কৌতূহলোদ্দীপক। তাঁর গ্রন্থ পাঠ করলে জ্ঞানের উত্তাপ পাওয়া যায়, শুধরে যায় পাঠকের সীমাবদ্ধতার প্রান্তগুলো। সম্প্রতি এই গুণী ভারত সরকারের পক্ষ থেকে পদ্মভূষণ সম্মানে ভূষিত হয়েছেন।

বিশ্বজিৎ ঘোষ
শিক্ষাবিদ, প্রাবন্ধিক

শেষপাতা

প্রকাশ কর্মকার

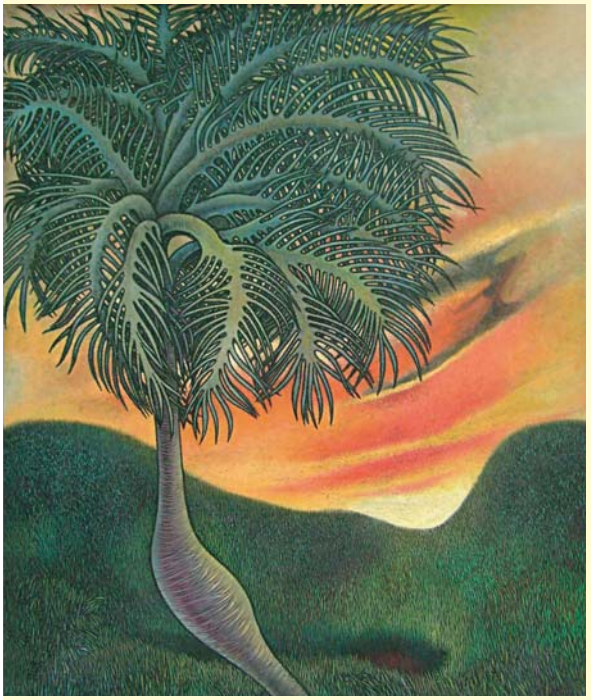

প্রকাশ কর্মকার সেইসব প্রবচনীয় শিল্পীর মহত্তম উদাহরণ যিনি শত অভাবঅনটন নের মধ্যেও শিল্পধারা থেকে বিচ্যুত হন না এবং একদিন বিশ্বনন্দিত শিল্পী হিসেবে পরিগণিত হন। তাঁর জন্ম কলকাতায়, ১৯৩৩ সালে। তাঁর পিতা প্রহ্লাদ কর্মকার ছিলেন তাঁর সময়কার বিখ্যাত শিল্পী, যিনি শিল্পকে পণ্যে রূপান্তরিত করেননি। ফলে প্রকাশের বাল্যকাল অতিবাহিত হয় প্রবল দারিদ্র্যের মধ্যে। তারপরও তিনি কলকাতা আর্ট কলেজে ভর্তি হন। চল্লিশের দশকের মাঝামাঝি কলকাতায় সংঘটিত হিন্দুমুসলিম দা ঙ্গার সময় তাঁর পিতার অনেক শিল্পকর্ম বিনষ্ট হয়।

১৯৪৯ সালে পিতামাতার মৃত্যুর পর প্রকাশ আর্ট কলেজ ছেড়ে সেনাবাহিনিতে যোগ দিতে বাধ্য হন। কিন্তু সেনাবাহিনির বাঁধাধরা জীবন তাঁর ভাল লাগেনি। দু'বছর পর জীবিকার্জনের তাগিদে তিনি ফের রঙতুলি হাতে তুলে নেন। গ্রাফিক ডিজাইনারের চাকরি নেন কলকাতার একটি মেডিক্যাল ফার্মে কিন্তু আর্থিক অবস্থার বিশেষ উন্নতি হয়নি। ১৯৫৬ সালে তিনি রাস্তায় ছবির প্রদর্শনী করতে শুরু করেন। ১৯৫৭ সালে তিনি নতুন দিল্লির জাতীয় শিল্পকলা প্রদর্শনীতে অংশ নেন। এরপর থেকে তাঁর রাস্তায় চিত্রপ্রদর্শনীর ঝোঁক দেখা যায়। এসময় কবিদের সঙ্গে তাঁর বিশেষ সখ্য গড়ে ওঠে। এমনও দেখা গেছে, তিনি ছবি আঁকছেন আর শক্তি চট্টোপাধ্যায় কবিতা লিখছেন। তারপর উভয়েই তাঁদের সৃষ্টিকর্ম বিক্রি করে দিচ্ছেন। ভারতের আর কোনও শিল্পীকে তাঁর মত রাস্তায় প্রদর্শনী করতে দেখা যায়নি।

প্রতিবাদী শিল্পীসত্তার জন্যে তাঁর চিত্রকর্মে প্রজন্মান্তরের ক্ষয়িষ্ণু মূল্যবোধ প্রকট হয়ে উঠত। তাঁর কাজে সর্বব্যাপ্ত সংশয়ের ছাপ স্পষ্ট। তাঁর চিত্রকলায় আধুনিক জীবনের যুগযন্ত্রণা লক্ষ্য করা যায়। তরুণ বয়সে নকশাল আন্দোলনের প্রতি তাঁর সহমর্মিতা প্রকাশ পায়। তাঁর শিল্পীসত্তা বিপ্লবী এই অর্থে যে, শিল্পী হিসেবে চিত্রশালায় প্রদর্শনীর আয়োজন করতে তিনি তেমন আগ্রহ বোধ করতেন না। তিনি বলতেন, আমার চিত্রকর্মকে আমি চারদেয়ালের মাঝে বন্দী করে রাখতে চাই না। এসময় তাঁর কাজে পিকাসো এবং ইম্প্রেশনিস্ট শিল্পীদের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

শিল্পীর জীবন কুসুমাস্তীর্ণ নয়। ১৯৬২ সালে তিনি কলকাতায় শিল্পীদের নিয়ে একটি সংগঠন গড়ে তোলেন। এটি অধুনা গড়ে ওঠা সমকালীন শিল্পী সমাজএর পূর্বসূরী। ১৯৬৪ '৬৭ সাল নাগাদ তিনি শিল্পী নীরদ মজুমদারের সঙ্গেও কাজ করেন। ইতোমধ্যে শিল্পীদের সংগঠিত করার প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় এবং তিনি সংগঠন ত্যাগ করে একটি ফেলোশিপ নিয়ে প্যারিসে চলে যান।

প্রকাশ কর্মকারের অধিকাংশ ছবিই অ্যাক্রেলিক ও তেলরঙের। প্যাস্টেল, ইনক, এমনকি জলরঙেও তিনি ছবি এঁকেছেন, তবে তেল বা অ্যাক্রেলিকেই প্রকাশের ক্যানভাস অধিক বাঙ্ময়। সরল প্রেক্ষাপটে মোটা কালির দাগে মানবশরীর ফুটিয়ে তুলতে প্রকাশ ছিলেন সিদ্ধহস্ত। তাঁর সব ক্যানভাসই মোটা ব্রাশে গাঢ় রঙে রঞ্জিত।

তরুণ বয়সে ইম্প্রেশনিস্ট শিল্পীদের কাজের দ্বারা প্রভাবিত হলেও উত্তরজীবনে তাঁর মনোজগতে অমূল পরিবর্তন আসে। তিনি বাংলার সহজিয়া রূপে মুগ্ধ হয়ে নিস্তরঙ্গ পল্লিজীবনের ছবি আঁকতে শুরু করেন। তাঁর ছবিতে কখনও কখনও গ্রামের মানুষজনের মুখে রাধাকৃষ্ণের মত পৌরাণিক চরিত্রের আদল ফুটে ওঠে।

জীবদ্দশায় প্রকাশ কলকাতার সরকারি আর্ট কলেজে শিক্ষকতা করতেন। কবিতাও লিখতেন তিনি। ১৯৭০ সালে তিনি রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মাননা লাভ করেন। ১৯৭৬ সালে লাভ করেন বিড়লা একাডেমি পুরস্কার এবং ২০০০ সালে অবনীন্দ্রনাথ পুরস্কার। শিল্পকলার সঙ্গে অনন্য বন্ধনের জন্যে তিনি রাষ্ট্রপতি পুরস্কারসহ বহু পুরস্কারস ম্মানে ভূষিত হন। ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ এই মহান শিল্পী কলকাতায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮১ বছর। তিনি ফুসফুসের সংক্রমণে ভুগছিলেন। মোটা রেখার উজ্জ্বল রঙ ও জটিল বয়নের নিসর্গ ও নগ্ন চিত্রের জন্যে তিনি ভারতীয় শিল্পধারার ইতিহাসে বিশিষ্ট হয়ে থাকবেন।

• নিজস্ব প্রতিবেদন

৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ সন্ধ্যায় গুলশানের ইন্দিরা গান্ধী মিলনায়তনে অর্ণ কমলিকার ভরতনাট্যম এবং ইফফাত আরা নার্গিসের সংগীত পরিবেশন

৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ গুলশানের ইন্দিরা গান্ধী মিলনায়তনে সেমন্তী মঞ্জরির রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশন ॥ ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ তাহসান খান এন্ড সুফি'সএর সংগীত পরি বেশন

১৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ গুলশানের ইন্দিরা গান্ধী মিলনায়তনে সায়ন চৌধুরী অর্ণব এন্ড ফ্রেন্ডসএর সংগীত পরি বেশন ॥ ২১ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায়, ডালিয়া আহমেদ ও রানা ঠাকুরের কবিতা আবৃত্তি 'আমি তোমায় ভালবাসি'

২২ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ গুলশানের ইন্দিরা গান্ধী মিলনায়তনে কিরণ চন্দ্র রায়ের লোকসংগীত ॥ ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ রাজরূপা চৌধুরীর সরোদ পরিবেশন

Regd. No. DA 355 Bharat Bichitra March 2014

सत्यमेव जयते

ভারতীয় হাই কমিশন, ঢাকা

জ্ঞাতব্য তথ্য

ভারতীয় হাই কমিশন, ঢাকা এবং সহকারী হাই কমিশন, চট্টগ্রাম ও রাজশাহীর ভিসা সেবা স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া (এসবিআই)-কে আউটসোর্স করা হয়েছে। এসবিআই বাংলাদেশে ছয়টি ইন্ডিয়ান ভিসা অ্যাপলিকেশন সেন্টার (আইভিএসি) পরিচালনা করে থাকে। এগুলি হচ্ছে: ১. আইভিএসি, গুলশান, ঢাকা, ২. আইভিএসি, মতিঝিল, ঢাকা, ৩. আইভিএসি, চট্টগ্রাম, ৪. আইভিএসি, সিলেট , ৫. আইভিএসি, খুলনা এবং ৬. আইভিএসি, রাজশাহী।

আইভিএসি-তে সকল কর্মদিবসে সকাল ৮টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত আবেদনপত্র গ্রহণ করা হয়। ভিসা প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হবার পর পাসপোর্ট বিকাল ৩টা থেকে সাড়ে ৭টার মধ্যে ফেরত দেওয়া হয়। আবেদন প্রক্রিয়া ও প্রয়োজনীয় তথ্যাদির পূর্ণ বিবরণ **www.ivacbd.com** এবং **www.hcidhaka.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাচ্ছে ।

হেল্পলাইনসমূহ: আইভিএসি, গুলশান, ঢাকায় আপৎকালীন প্রয়োজন মেটানোর বিশেষ ব্যবস্থা আছে। এখানে চিকিৎসা ও অন্যান্য জরুরি পারিবারিক প্রয়োজন সংক্রান্ত ভিসা আবেদন গ্রহণের জন্যে একটি কাউন্টার রয়েছে।

আইভিএসি, গুলশান-এর হেল্পলাইন ডেস্ক: ই-মেইল: info@ivacbd.com, এবং visahelp@ivacbd.com; ফ্যাক্স: +৮৮০২ ৯৮৬৩২২৯; টেলিফোন: +৮৮০২ ৮৮৩৩৬৩২, +৮৮০২ ৯৮৯৩০০৬ (রবিবার থেকে বৃহস্পতিবার সকাল ৯টা থেকে বিকাল সাড়ে ৫টা)

ভারতীয় হাই কমিশন, ঢাকার ভিসা হেল্পলাইন ডেস্ক: ই-মেইল: visahelp@hcidhaka.gov.in; টেলিফোন: +৮৮০২ ৯৮৮৮৭৯২ (রবিবার থেকে বৃহস্পতিবার সকাল ৯টা থেকে বিকাল সাড়ে ৫টা)

জনসাধারণের জন্য জ্ঞাতব্য:

- ভারতীয় ভিসা পেতে বাংলাদেশের নাগরিকদের কোনও ভিসা ফি দিতে হয় না। আইভিএসি প্রক্রিয়া ফি বাবদ আবেদনপত্র পিছু যে চারশত টাকা নেয়, তা ফেরতযোগ্য নয়।
- ভিসা আবেদনপত্রে প্রদত্ত সকল তথ্যের নির্ভুলতার ব্যাপারে আবেদনকারী দায়ী থাকবেন।
- আবেদনপত্রে যে কোন ভুলের জন্য আবেদনপত্র অগ্রহণযোগ্য হতে পারে।
- আবেদনপত্রের সঙ্গে সদ্যতোলা ছবি (৩ মাসের বেশি পুরনো নয়) সংযোজন করতে হবে।
- আবেদনকারী ভারতভ্রমণে কোন্ শ্রেণীর ভিসা চান তার উলেখ করতে হবে–
  ১. মনে রাখতে হবে যে, একান্ত জরুরি না হলে ট্যুরিস্ট ভিসায় ভারতে গিয়ে চিকিৎসা করানোর অনুমতি নেই।
  ২. নিয়মিত ও পূর্ব-নির্ধারিত চিকিৎসা সেবার জন্য কেবল মেডিক্যাল ভিসার জন্যই আবেদন করতে হবে।
  ৩. রোগীর সঙ্গে মাত্র ৩ জন মেডিক্যাল এটেনডেন্ট যেতে পারবেন এবং তাঁদের একত্রে ভিসার আবেদন করতে হবে।
  ৪. ব্যবসায়ের জন্য ভারতে যেতে ইচ্ছুক ব্যক্তিকে বিজনেস ভিসার জন্য আবেদন করতে হবে।
- ভুল তথ্য-উপাত্ত সংক্রান্ত কাগজপত্র প্রদানের জন্য আবেদনকারীরাই দায়ী থাকবেন।
- আবেদনপত্র জমা নেওয়ার সঙ্গে ভিসাপ্রাপ্তির কোন নিশ্চয়তা নেই। যে কোনও সময় কোন কারণ ছাড়াই ভিসা প্রত্যাখ্যাত হতে পারে।

উপরোক্ত নিয়মাবলী পালন করলে ভিসাপ্রাপ্তি সহজ হবে।

জনস্বার্থে ভারতীয় হাই কমিশন, ঢাকা কর্তৃক প্রচারিত